বর্ণবহ্নি

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

ঈশান
৭৯/২ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৪৪

প্রকাশক : জহর ঘোষ, ঈশান
৭৯/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : অজিতকুমার সাউ, নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : স্বপন দাস

বর্ণবহ্নি

ভূমিকার বদলে

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প বাছতে প্রকাশকদের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ তাঁর সব গল্পই ভাল গল্প। অসংখ্য গল্পের মধ্য থেকে এমন একটা গল্প বেছে বার করা কঠিন যা পড়ে পাঠকের মনে হবে এ গল্পে তিনি কিছু পেলেন না, বা এ গল্পে নরেন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল না। সুতরাং তাঁর যে কোন গল্প নিয়েই সংকলন হতে পারে।

আমরা অনেকটা সেভাবেই এই সংকলন করেছি। এই সংকলনে যে ন'টি গল্প নেওয়া হয়েছে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—পূজো সংখ্যায় বা সাধারণ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। তবে কোনটিই এ পর্যন্ত কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এ গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর ওই সময়ের মধ্যে লেখা অনেক গল্প অগ্রথিত থেকে গিয়েছে। ইদানীং গল্পের বই কম ছাপা হয়। সেই কারণেই 'ঘাম' (চতুরঙ্গ), 'নাবিক' (শারদীয় দেশ), কিংবা 'ভেনাস' (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার)-এর মত ছোটগল্পকে বই আকারে বেরোবার জন্য এতকাল অপেক্ষা করতে হল।

সংকলনের সবগুলি গল্পই ছোট গল্প, শুধু 'বর্ণবহ্নি' (শারদীয় সিনেমা জগৎ) বাদে। 'বর্ণবহ্নি' আকারে প্রায় উপন্যাস হলেও, মেজাজের বিচারে একে আমরা বড় গল্প হিসেবেই নিয়েছি।

একদিক থেকে এই সংকলনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। নরেন্দ্রনাথের শেষ বড় গল্প 'বর্ণবহ্নি' এবং সর্বশেষ ছোট গল্প 'মিনিবাস' (শারদীয় কথাসাহিত্য) এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুটি রচনা আমাদের সংকলনকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে বলেই আমরা মনে করি।

প্রকাশক

ঘাম

অধীর হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল বিজন। পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। —এই আসছি বলে, আধ ঘণ্টাবও বেশি হয়ে গেল সুনন্দা ওপাশের অমূল্যবাবুদের ফ্ল্যাটে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওর দেখা নেই। এব পরে কি আর কারো বাড়িতে চা খেতে যাওয়া যায়? তা ছাড়া যেতেও তো সময় লাগবে। এই দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট থেকে টালিগঞ্জের চারু এভেনিউ কি সোজা রাস্তা? তারপর মাথা খুঁড়লেও এখন এই ববিবারের বিকালে একখানা ট্যাকসি মিলবে না। বাসের ভিড় ঠেলে উঠে দুহাতে মাথার ওপরের রড ধরে এঁকে বেঁকে সার্কাসের নানারকম কসরৎ করতে করতে তবে গিয়ে পৌছুতে হবে।

কিন্তু যত কষ্টই হোক না গেলে চলবে না। এত করে বলে দিয়েছে যখন অনিমেষ-বিশেষ করে ওর স্ত্রী শুভ্রা যখন যখন অনুরোধ করেছে বিজনরা যদি না :য় খুবই খারাপ দেখাবে। কিন্তু সন্ধ্যা-বেলায় চায়েব নিমন্ত্রণে রাত দুপুরে গিয়ে হাজিব হলেই কি খুব ভালো দেখায়? সুনন্দার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

বিজন আরো পাঁচ মিনিট দেখল। পাঁচ মিনিট পাঁচটি ঘণ্টার মত মনে হতে লাগল। আর একটি সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরে আসতে না আসতে বিজন চেঁচিয়ে উঠল-ও রাঙার মা!

বুড়ী ঝি উপুড় হয়ে বসে ভিজে ন্যাতা দিয়ে ঘরের মেঝে পুঁছে নিচ্ছিল, চোখ তুলে তাকাল-কী বলছ দাদাবাবু?

বিজন ধমকের সুরে বলল—তোমাকে এই অবেলায় ঘর পুছতে কে বলেছে?

—বউদি বলে গেছে দাদাবাবু। রোজই এই সময় ঘর পুছি।

বিজন বলল—না পুছতে হবে না। যাও এই তিন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে তোমার বউদিকে ডেকে নিয়ে এসো তো। যাও এখুনি ডেকে নিয়ে এসো।

ন্যাতা আর জলের বালতি রেখে রাঙার মা দোর খুলে বেরোল। নির্বিকার ভাবে পান চিবুচ্ছে তো চিবুচ্ছেই। বয়স ষাটের কাছাকাছি রাঙার মার। বছর তিনেক ধরে বিজনদের কাছেই আছে। বকুনি দুজনের কাছেই খায়। কিন্তু তেমন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ধৈর্য আছে। বোধহয় অভিজ্ঞতাও আছে। রাঙার মা বোধ হয় ভাবে সংসারে যারা বকবার বকবে আর যারা কাজ করবার তারা কাজ করে যাবে। রাগের সময় এই কুরূপা বৃদ্ধা ন্যুব্জা নারীদেহের ভগ্নাবশেষ বিজনের মনে অস্বস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। সুনন্দাও ওর সঙ্গে কম বকাবকি করেনা। ওর অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে অবাধ্যতা নিয়ে মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে হুলুস্থূল বাধিয়ে দেয়। কাজ ছেড়ে চলে যেতেও বলে। কিন্তু রাঙার মা কাজও ছাড়ে না। চলে যায় না। জানে যে তাকে ছাড়া বিজনদের চলবে না। বয়স পড়ে গেলে দুজনেই ওরা রাঙার মাকে সাধাসাধি শুরু করবে।

একটু বাদে সুনন্দা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। একা নয়, কোলে একটি বাচ্চা। বছর ছয়েকের একটি ছেলে। যেমন কালো তেমনি রোগা। পাশের ফ্ল্যাটের অমূল্য নিয়োগীর কনিষ্ঠ সন্তান।

—অত চেঁচামেচি শুরু করেছ যে! বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে ?

সুনন্দা পাশের ঘর থেকে খোলা দরজা দিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিজন লক্ষ্য করল স্ত্রীর মুখে ডাকাত পড়বার মত কোন উদ্বেগ কি আশঙ্কা নেই। ওর মুখে হাসি। হাসলে সবাইকেই ভালো দেখায়।

সুনন্দার দাঁতের গড়ন সুন্দর বলে আরো যেন বেশি সুন্দর দেখায় ওকে। বয়স বছর চল্লিশেক হতে চলল সুনন্দার। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন তিরিশও পার হয়নি। দীর্ঘ দোহারা চেহারা। মাথায় প্রায় বিজনের সমান সমান। বিজন সাড়ে পাঁচ। সুনন্দা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পাশাপাশি হাঁটলে সুনন্দাকে এক ইঞ্চি ছোট দেখায় না বরং বড়ই দেখায়। কিন্তু এত দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও ওর দেহের গড়ন ভালো বলে স্ত্রীকে বিজনের বেমানান লাগেনা। গায়ের রঙে নাক চোখের গড়নে সুনন্দা বেশ সুশ্রী। প্রথম প্রথম বন্ধুরা বিজনকে বলত-তুমি তো রীতিমত সুন্দরী ভার্য।

তাদের গলায় ঈর্ষার আমেজ থাকত।

বন্ধুদের চোখ থেকে সেই মোহ আর লুব্ধতা এখনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি।

কিন্তু সুনন্দা যাকে কোলে নিয়ে এই মুহূর্তে গণেশ জননী সেজেছে তাকে কিন্তু ওর কোলে একেবারেই মানায়নি। বাচ্চাটি বেশ কদাকার। অমূল্যবাবুর সবগুলি ছেলেমেয়েই তাই। কিন্তু সবচেয়ে শেষেরটি কুরূপতায় যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এইটির ওপরই সুনন্দার যেন সবচেয়ে বেশি পক্ষপাত। আসলে একটি মাংস পিণ্ডকে বুকে চেপে ধরে সুনন্দা আদর করতে চায়। তার আকার প্রকার যেমনই হোকনা তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিজনের মনে হল সুনন্দার এখনকার হাসি দেখলে তার কোন বন্ধু অপলক হয়ে থাকত না। কারণ এই মুহূর্তে বিজনের স্ত্রীর হাসি কোন স্ত্রীর হাসি নয় মায়ের হাসি। বাৎসল্যরসে বিগলিত।

সুনন্দা বলল—হল কী তোমার? একেবারে শিবনেত্র হয়ে রইলে যে।

বিজন বলল—শিব হয়ে গণেশজননীকে দেখছি।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল—আহা! তারপর সেই মানবকটির

মুখের কাছে মুখ নিয়ে সুনন্দা বলতে লাগল—শুনছ বিন্টু লোকে কী বলে শুনছ? তুমি নাকি গণেশ? কেন তুমি গণেশ হবে শুনি? তোমার কি হাতির মত মাথা? তোমার কি শুঁড় আছে? দেখ কি রকম হাসছে দেখ। থাক থাক আর হাসতে হবেনা তোমাকে।

বিজন দেখল সুনন্দার সুডৌল সুগৌর মুখখানা ওই কদাকার মাংস পিণ্ডটির ওপর নেমে এল। নাক ঘষতে লাগল কপালে। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল। মনে হল দাঁত ঘষার শব্দও যেন শুনতে পেল বিজন। তীব্র যৌন আবেগে ক্রোধে আর গভীর বাৎসল্যে প্রায় একই রকম দাঁত ঘষার শব্দ শোনা যায় সুনন্দার বিজন লক্ষ্য করেছে।

আরো একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল। মাত্র গুটি কত দাঁতে পান চিবুতে চিবুতে উপভোগ করছিল এই অপরূপ বাৎসল্যের দৃশ্য।

রাঙার মা সুনন্দার আরো কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। হেসে বলল-এত সখ তোমার ছেলের। আহা একটি বাচ্চা যদি তোমার কোলে আসত কী ভালোই হত বউদি। তোমাকে অত করে বললাম চল যাই আমার সঙ্গে কাঁকুড়গাছির বুড়ো শিবের ওখানে। বাবার কাছে যে যা মানৎ করে তাই ফলে। একটি ফল দিয়ে এসে মনের মত ফল পাবে বউদি।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল—থাক থাক হয়েছে। তোমার আর ফল ফল করতে হবে না।

রাঙার মা বলল—তাতো হবে না বুঝলুম। কিন্তু এ তোমার হল কী বউদি। ঘামে যে একেবারে নেয়ে উঠেছ। এই কার্তিক মাসের দিনে এত ঘাম।

স্ত্রীর লজ্জার শরীর বিজনও লক্ষ্য করল। লক্ষ্য করে একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

সুনন্দা লজ্জিতভাবে হাসল। স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিকে বলল,—আচ্ছা এক আপদ হয়েছে। বাচ্চা টাচ্চা কাউকে কোলে নিলেই আমার এমনি করে ছোটে।

নিজের দেহের দিকে তাকাল একবার সুনন্দা, কোলের বাচ্চাটির দিকে তাকাল, তারপর ফের একটু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হেসে বলল—এ এক রোগ। যাই ওকে ওর মার কাছে রেখে আসি।

কিন্তু এই অস্বাভাবিক ঘামকে যে সত্যিই আপদ কি রোগ ব্যাধি বলে মনে করে সুনন্দা তা ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হল না। দুর্ভোগ নয় যন্ত্রণা নয় এই রোগের উপভোগ্যতাই ওর চোখের ভঙ্গিতে, মুখের হাসিতে, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে অতি মাত্রায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সুনন্দা স্বামীর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল—তুমি আর একটু বোসো লক্ষ্মীটি। আমি ওকে রেখে এক্ষুনি আসছি।

বিজন হঠাৎ তিক্ত তীব্র কঠিন স্বরে বলে উঠল—আর আসতে হবে না।

সুনন্দা হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়াল। ভ্রূ কুঁচকে বলল—তার মানে?

বিজন বলল—মানে আবার কি। অমূল্যবাবুদের ঘরে যাও। গিয়ে ফের বিণ্টু পিণ্টু মিণ্টু রিণ্টুদের আদর সোহাগ করতে বসে যাও। ছটা বাজে। কারো বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়ার সময় আর নেই। এখনো কাপড় বদলাবার সময় পেলে না তুমি। আদর সোহাগ নিয়েই আছ। এর পর কখন বা তৈরি হবে। কখন বা যাবে। যেতেও তো ঘণ্টা খানেক লেগে যাবে।

সুনন্দা বলল—সে আমি বুঝব। তৈরি হতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। আমি কি তোমার মত? এক দাড়ি কামাতেই দেড় ঘণ্টা?

বিণ্টুকে রেখে আসতে গেল সুনন্দা। গিয়ে আর দেরি করলনা। দুতিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে বিজন এতক্ষণ খাড়া চেয়ারটায় বসে কথা বলছিল, কিন্তু স্ত্রী ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সে গরদের পাঞ্জাবিটা খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে দিল তারপর নেমে এসে নিচু ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট ধরাল।

সুনন্দা এসে বলল—একি তুমি জামাটামা সব ছেড়ে ফেললে যে।

বিজন বলল—কী হবে আর গিয়ে? রাত দুপুরে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে লাভ কী।

সুনন্দা বলল—সবে তো সন্ধ্যা। এখনই তোমার রাত দুপুর হয়ে গেল? তোমার রাগের কারণ আমি জানি।

—জানো! কী বলতো দেখি।

—বলে আর লাভ কী।

সুনন্দা পাশের ঘরে শাড়ি বদলাতে যাচ্ছিল, বিজন বাধা দিয়ে বলল—সুনন্দা শুনে যাও। আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

সুনন্দা বলল—আসছি? আমি তো পালিয়ে কোথাও যাচ্ছিনে। আচ্ছা, মাঝে মাঝে তোমার কী হয় বলতো দেখি। কারো ছেলে মেয়েকে কোলে করতে দেখলে তুমি যেন একেবারে উন্মাদ হয়ে যাও। তোমার দুটো চোখ হিংসেয় যেন জ্বল জ্বল করতে থাকে। আমাদের ঘরে কেউ আসেনি। তাই বলে পৃথিবীতে আর কারো ছেলে মেয়ে কি থাকবে না? কি তাদের কাউকে আমি একটু আদর যত্ন করতে পারবনা? একি হিংসুটে স্বভাব তোমার।

ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে বুলিয়ে রাঙার মা তখনো মেঝে পরিষ্কার করছিল-হঠাৎ সে মুখ তুলে বলে উঠল—ঠিক বলেছ বউদি, ভগবান মন বুঝেই ধন দেনতো।

বিজন সোজা হয়ে উঠে বসল তারপর তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—চুপ! তোমার আর ঘর পুছতে হবে না। যাও এঘর থেকে। বেরিয়ে যাও।

জলের বালতি হাতে রাঙার মা দাঁড়াল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল—একী কাণ্ড রে বাবা। এমন তো কোথাও দেখিনি।

কথায় কথায় মারতে ওঠে, এ কোন ধারার ভদ্দর লোক।

রাঙার মা সামনে থেকে সরে গেলে সুনন্দা তার জায়গায় এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত চুপ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,—তোমার কী হয়েছে বলতো!

বিজন বলল—আমার কিছু হয়নি। হঠাৎ তোমার মনেই একটু বেশি মাত্রায় বাৎসল্যের উদয় হয়েছে।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। একটু বাদে আস্তে আস্তে বলল—যদি হয়ে থাকে সেটা কি খুব দোষের? আমাদের যা বয়েস—

বিজন বলল—থাক থাক আর বয়েস বয়েস কোরো না। বয়েসের কথা কি তোমার সব সময় মনে থাকে? বিশেষ করে বেশবাশ সাজ সজ্জার সময়!

—তার মানে?

নিজের কথার টীকা টিপুনীর ঝুঁকি নিলনা বিজন। বরং আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া নিরাপদ মনে করে বলল—আমাদের যা বয়েস তাতে বাৎসল্য আসাটা দোষের নয় কিন্তু তারও তো একটা স্থান কাল আছে। অমূল্যবাবুর ছেলেমেয়েরা তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। ঘুরে এসে তাদের আদর সোহাগ করতেও পারতে।

এবার সুনন্দা ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কেবল অমূল্যবাবুর ছেলে আর অমূল্যবাবুর ছেলে। ওরা হয়েছে তোমার দুচোখের বিষ। তোমার ভয়ে কোন একটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এঘরে ঢুকতে পারে না।

তুমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকো আমি কাউকে ডাকিও না আনিও না। কিন্তু পাড়াশুদ্ধ লোক তোমাকে চেনে। তোমার এই কুচুটে স্বভাব নিয়ে বলাবলি করে। আমি লজ্জায় মরে যাই। আমাদের হয়নি হয়নি। তাই বলে বিশ্বশুদ্ধ লোক তোমার মত নিঃসন্তান হবে তুমি কি তাই চাও ?

বিজন এবার চেয়ার ছেড়ে তীর বেগে উঠে দাঁড়াল। ঘরের দু-দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—না তা চাইনে। আমি নিঃসন্তান হলেও তুমি যদি কোন প্রকারে সন্তান-বতী হতে পারো হও না। আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এ কথা তো আমি অনেকদিন বলেছি।

সুনন্দা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল,—এসব কী বলছ তুমি ? হিংসেয় হিংসেয় তোমার সত্যিই কি মাথা খারাপ হয়েছে ? মাঝে মাঝে তোমার মাথার মধ্যে কতকগুলি পোকা ঢুকে কিলবিল শুরু করে দেয়, তাই না ? সত্যি করে বলো, তাই দেয় কিনা ?

হিংস্র জিঘাংসায় বিজনের মুখ বিকৃত দেখাল। সে বলে উঠল,—তা যদি বলো, সে পোকা তোমার মাথার মধ্যেও ঢোকে। মুহুর্মুহু কামড়ায় আর বলে তুমি যেমন করে পারো মা হও, যার সাহায্যে পারো—

সুনন্দা প্রচণ্ড ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল,—যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও। তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হয়। তুমি এত ছোট, এত মীন মাইণ্ডের, এত পারভারসন তোমার মধ্যে। কোন সুস্থ মেয়ের পক্ষে একঘরে তোমার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।

বিজন বলল,—তুমি তো তাই চাও। এক ঘরে আর বাস করতে চাওনা। বেশতো, ঘর বদলে, মানুষ বদলে এক্সপেরিমেণ্ট করে

দেখতে পারো এখনো। সে বয়েস তোমার আছে। এখনো অন্তত একটি ডিকেড হাতে আছে তোমার।

সুনন্দা বলল—এক্সপেরিমেণ্ট যদি করতে হয় তোমার পরামর্শ নিয়ে করব না। আমি আমার সুবিধেমত পথ বেছে নিতে পারব। তোমাকে সে জন্যে ভাবতে হবে না।

বিজন বলল,—তা জানি। তোমাকে পরামর্শ দেওয়ার লোকের এখন আর অভাব নেই। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি শোন, কথায় কথায় যে তুমি নিঃসন্তান তুমি নিঃসন্তান বলে খোঁচা দাও, তুমি কি জানোনা ডাক্তার আমার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পায়নি?

সুনন্দা ফের একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—ডাক্তার কি আমার মধ্যেই কোন দোষ পেয়েছেন? ডাক্তার যা যা করতে বলেছেন সবইতো আমাকে দিয়ে করিয়েছ? দু দু বার অপারেশন হয়ে গেছে, আর কী করতে বলো আমাকে?

সুনন্দার দুটি চোখ এবার জলে ভরে উঠল। মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে এবার দোরে খিল দিল সুনন্দা।

আর স্ত্রীর চোখে জল দেখে বিজনের সম্বিৎ ফিরে এল। ছি-ছি-ছি, কথাটা ওকে বলা ঠিক হয়নি। যদি নিজের দোষেই বন্ধ্যা হয়ে থাকে সুনন্দা সে জন্যেও কোন দুর্ভাগিনী নারীর মুখের ওপর বলা পরম নির্মমতা। এবার গ্লানি আর অনুশোচনায় মন ভরে উঠল বিজনের। জামাটা ফের গায়ে দিল। স্ত্রীকে নিয়ে এবার নিমন্ত্রণ রাখতে বেরোবে। ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নেবে। পাওয়াটা হয়তো একেবারে কঠিন হবেনা। শ্যামবাজারের মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি মিলে যেতেও পারে।

বিজন এগিয়ে গিয়ে রুদ্ধদ্বারে—ঠিক করাঘাত নয়, সস্নেহে টোকা দিতে লাগল।—নন্দা, তৈরি হয়ে নাও। চল এবার অনিমেষদের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

প্রথমে খানিকক্ষণ কোন সাড়াই মিলল না। তারপর স্নুনন্দার .বিরক্তিভরা গলা শোনা গেল—তুমি যাও আমি যাব না।

বিজন মধুর স্বরে বলল,—সেকি হয় নন্দা? অনিমেষ কী মনে করবে বলতো? ওরা যে দুজনকেই বলেছে? আর বিনা উপলক্ষে তো বলেনি। তুমি তো জানো ওদের আজ ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। ওরা সে কথা না বললেও তারিখটা তো আমাদের মনে আছে। ওরা রেজিষ্ট্রেশনের তারিখটাই ধরে। তিনজন সাক্ষীর মধ্যে, দুজন তো আমরাই ছিলাম মনে নেই তোমার?

কিন্তু স্নুনন্দা এসব অবান্তর কোন কথা কানেই তুলল না। একই কথা সে বারবার বলতে লাগল,—তোমার যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি যাবনা। কারো কোন শুভ কাজে যাওয়ার অধিকার আমার নেই। কাউকে মুখ দেখাবার মত মুখ আমার নেই, তুমি যাও।

আরো মিনিট পনের স্ত্রীকে সাধাসাধি করে বিজন ক্ষান্ত হ'ল। এই এক দোষ স্নুনন্দার। একবার যা 'না' করবে মাথা খুঁড়ে মরলেও বিজন তাকে 'হ্যাঁ' করাতে পারবে না। বড় জেদ স্নুনন্দার। আর ক্রমে বেড়েই চলেছে। কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে বলে আরো বাড়বে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যা নারীর আরো কত বিকৃতি আসবে তার ঠিক কি। এই যে ঘরে দোর দিয়েছে স্নুনন্দা ঝাড়া দু ঘণ্টার মধ্যে সে দোরও আর খুলবে না। পৃথিবীতে যদি ইতিমধ্যে প্রলয়কাণ্ডও ঘটে যায় তবু দরজার খিল এঁটে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে। স্নুতরাং বিজন এবার দুঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। চলে যেতে পারে যে দিকে দুচোখ যায় যে পথে মন তাকে টেনে নিয়ে যায় সে পথে পা বাড়াতে বিজনের এখন আর কোন বাধা নেই। তারপর দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা বাদে তার ভাগ্য যদি ভালো হয় বিজন এসে দেখবে স্নুনন্দার ঘরের দরজা আপনিই খুলে গেছে। তার গৃহিনী ফের

ঘর সংসারের কাজে হাত লাগিয়েছে। আর নসিব মন্দ হলে সারারাত এমনকি পরদিন সকালেও এর জের চলবে।

রাঙার মাকে ডেকে সদর বন্ধ করতে বলে বিজন রাস্তায় নেমে পড়ল।

অনিমেষ চৌধুরীদের ওখানে যাবে কি ? . কিন্তু একা একা যেতে এখন আর ইচ্ছা করছে না। ঝগড়াঝাঁটির ছাপ…মনের ওপর তো রয়েছে, মুখেও কি খানিকটা খানিকটা লেগে নেই বিজনের ? এই মন নিয়ে, এই মুখ নিয়ে লোকসমাজে তারও যাওয়া এখন অনুচিত। বিশেষ করে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের বাড়িতে।

—এই যে স্যার, কোথায় যাচ্ছেন এদিকে ?

ছেলেটি পথের মধ্যে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বিজন একেবারে আত্মমগ্ন ছিল। বিজন একটু চমকিত, একটু বা অপ্রস্তুত। এত ভক্তি আজকাল বড় একটা দেখা যায়না। ছেলেটি বোধহয় সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। কি কোন মফঃস্বল শহর থেকে।

— স্যার আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

বিজন বলল,—বাঃ চিনতে পারব না কেন ? তুমি তো আমাদের কলেজেরই—। মুখ তো খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ স্যার। আমার নাম প্রদীপ। প্রদীপ মজুমদার। আমাকে হিষ্ট্রি অনার্স ক্লাসে দেখেছেন। আমরা এ পাড়াতেই উঠে এসেছি। আমাকে আরো কটি ছেলে বলছিল প্রফেসর দাশগুপ্ত এই পাড়ায় থাকেন। আচ্ছা স্যার আপনি কি এই হলদে রঙের ফ্ল্যাট বাড়িটায়—

—হ্যাঁ। তিনতলায়। চার নম্বর ফ্ল্যাট। চার নম্বর ফ্ল্যাটে যেয়ো একদিন।

প্রদীপ খুশি হয়ে বলল,—নিশ্চয়ই যাব স্যার। কোন অসুবিধে হবে নাতো বাড়িতে গেলে ?

বিজন ছাত্রের পিঠে হাত রেখে হেসে বলল-বাঃ অসুবিধে কিসের ? যেয়ো, অবশ্যই যেয়ো।

প্রদীপ হেসে বলল,—আপনাকেও একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে স্যার। বাবা খুব খুশি হবেন, আমরা কাছেই-ওই মোহনলাল মিত্র ষ্ট্রীটে— ।

বেশতো বেশতো। বিজন ফের ওর পিঠে হাত বুলালো আর পিঠে হাত রেখেই দু'পা এক পা করে উত্তর মুখে এগোতে লাগলো।

একটুবাদে বিদায় নিল ছেলেটি। বেশ লাগল ওকে। ওকে আর ওর পৃষ্ঠপোষক শুভানুধ্যায়ী আর ছাত্রবৎসল হিসাবে নিজেকে। সুনন্দা মাঝে মাঝে রাগ করে যাই বলুক বিজন সন্তান-হীন বলে হীনমনা নয়, ক্ষুদ্রচেতা নয়, ছাত্রদের মধ্যে সে পুত্রকে দেখতে জানে। আগে আগে প্রথম বয়সে ছাত্রদের মনে হত ছোটভাইয়ের মত, এখন আস্তে আ'স্তে তারা ছেলের স্থান নিচ্ছে। মুখে অবশ্য বাবা বাছা বলে ডাকে না বিজন, ডাকতে পারে না। মুখে কেমন বাধো বাধো লাগে। কিন্তু যে স্নেহটুকু অনুভব করে তা নিখাদ বাৎসল্য। বাৎসল্য ছাড়া কিছু নয়। ক্লাশেও সে জনপ্রিয়। কলেজে ছাত্রদের কোন অনুষ্ঠান হলে প্রিন্সিপ্যাল বিজনের ওপর তার ভার দেন। ছোটেখাটো ছাত্র বিক্ষোভ মিটাবার দায় ও বিজন দাশগুপ্তের। ক্লাশে রোলকল করার সময় মাঝে মাঝে এক নিমেষের জন্য থেমে সে ক্লাস ভরতি ছাত্রদের দিকে তাকায়। অধ্যাপনা তার অতীতকাল নিয়ে। কিন্তু যারা অধ্যয়ন করে তারা তো উত্তর কালের। এক পলকের জন্যে যেন সেই ভাবীকালের দিকে বিজন অপলক হয়ে থাকে। কাল সমুদ্রে তরঙ্গের পরে তরঙ্গ। সব সময় এদের সে বুঝতে পারে না। কখনো কখনো মনে হয় এরা যেন বেশি উদ্ধত অহঙ্কৃত আর সেই সঙ্গে অবোধ। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয় যৌবনের এই হয়তো ধর্ম। প্রৌঢ়ের প্ল্যাটফর্ম থেকে যৌবনকে

হয়তো এইরকমই দেখায়। তাদের প্রতিটি কথার মধ্যে অহংকারের ঝংকার লাগে। এই উত্তরকালের পক্ষ নিয়ে সমবয়সী কি নিজের চেয়েও বেশী বয়সী সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক করে বিজন। তাঁরা হয়তো ভাবেন যেহেতু বয়সে প্রৌঢ় বলেও তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হয় না তাই সে যুবকদের পক্ষ নিয়ে যৌবরাজ্যে স্থায়ী আসন নিতে চায়। যেহেতু সে জৈবিক দিক থেকে আর একটি জেনারেশনের সৃষ্টি করেনি তাই সে যেন এক জেনারেশন পিছনে সরে যেতে চায় না। আসলে তা নয়। পুরাকালের সঙ্গে এ কালকে আর উত্তরকালকে সে মিলিয়ে দেখতে চায়। এই তিনকালের রাজনীতি, রীতিনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি একই সম্পর্কমূলে যুক্ত এই তার বলবার কথা।

সহকর্মী বন্ধু অনিমেষ দত্তের সঙ্গেও কি এই নিয়ে কম তর্ক হয় নাকি তার। অনিমেষ বিজনের চেয়ে অন্তত পাঁচ বছরের ছোট। আধুনিক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু ভাবনায় ধারণায় ওকে অনেকখানি আধুনিক বলে মনে হয় বিজনের। আর বিজ্ঞান ? বিজ্ঞান শুধু ওর ক্লাসরুমে আর লেবরেটরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান ওর দৃষ্টিতে নেই, যুক্তিতে নেই, দৈনন্দিন আচার আচরণে জীবনযাত্রায় নেই। তবু অনিমেষ আর অঞ্জলি তুজনই বিজনদের বন্ধু। আর বিয়ের পাঁচবছরের মধ্যে তুটি ছেলেমেয়ের বাপ মা হয়ে ওরা বিজনদের ওপর কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল। সহানুভূতি কি অনুকম্পা অবশ্য বিজন চায় না। কিন্তু বন্ধুত্ব চায়। আর এটুকু জানে এই প্রগাঢ় প্রৌঢ় বয়সেও সেই বন্ধুত্ব ছোটখাটো মতবিরোধ রুচিবিরোধ এমনকি আদর্শের বিরোধও ছাপিয়ে চলে যায়। বন্ধুত্ব নিজেই এক শিল্প-এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যদিও তার মত উত্তর চল্লিশ অধিকাংশ পুরুষের কাছেই আপদ বিশেষ, অনাসৃষ্টির মত।

অনিমেষের ওখানে যেতে পারলে বড় ভালো হত। বিজনদের না দেখে ওরা ক্ষুণ্ণ হয়ে তুঃখ পাবে। ওরা তো জানে না অকারণ

দাম্পত্যকলহ তাদের যাওয়াটাকে এমন করে ঠেকিয়ে রাখল। কিন্তু কয়েকবার মহড়া দিয়েও নিজেকে দক্ষিণগামী কোন্ একটা জনবহুল বাসে ঠেলে তুলতে পারল না বিজন। বড্ড ভিড়। আর একা একা যাওয়ার পক্ষে বড় দীর্ঘ পথ। পনের বছর ধরে একাকিত্ব আর এককত্ব গেছে বিজনের। এখন যেন ভাবাই যায় না জীবনের সাতাশ আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত সে একক ছিল। মনে হয় যেন জন্মাবধি দাম্পত্য জীবন চলেছে। স্ত্রী এক অভ্যাস। সন্তান দ্বিতীয় অভ্যাস। অভ্যাস ছাড়া আর কি।

কিন্তু না গেলেও একটা ফোন করে দেওয়া দরকার। অন্তত সেইটুকু সৌজন্য অনিমেষ দাবি করতে পারে। ফোন অনিমেষের আছে বিজনের নেই। কিন্তু সারা পাড়াতেও কোথাও একটি টেলিফোন খুঁজে পাবে না এমন কৈফিয়ৎ বিজন বন্ধুকে কী করে দেবে।

শেষ পর্যন্ত বসাক ফার্মেসিরই শরণ নিল বিজন। ডাক্তার এখনো আসেননি। কাউন্টারের পিছনে উঁচু টুলের ওপর রোগাটে কম্পাউণ্ডার বসে আছেন।

বিজনকে দেখে ভদ্রলোক হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন,—এই সে স্যার আসুন স্যার। বাড়ির সব ভালো তো?

বয়স বেশি নয় রাখালবাবুর। কিন্তু এরই মধ্যে সামনের কটি দাঁত গেছে। হয়তো সেই জন্যেই হাসিটি দেঁতো হাসি নয়।

—হ্যাঁ ভালো। একটা ফোন করব।

রাখালবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

ফোনে সরাসরি অনিমেষকেই পাওয়া গেল।

—হ্যালো। অনিমেষ, যেতে পারছিনে ভাই!

অন্যপারে এক নিমেষের নিস্তব্ধতা, নৈরাশ্য।

—কেন কী হল তোমার?

—কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। ধরোনা ছোটখাটো গোছের একটা অঘটন।

—যাক। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তেমন কিছু নয়। হয়তো বৌদির পান থেকে চুন খসেছে।

—যা বলেছ। বয়েস হোক তোমাদেরও মাঝে মাঝে খসবে।

—আজকের দিনে ও অভিশাপ আর দিয়োনা বিজন, এমনিতেই ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত নিয়ে আছি।

বিজন হেসে বলল,—তাই নাকি? দাম্পত্যজীবনের রীতিই তাই।

—প্রভাতে মেঘডম্বুর!

—শুধু প্রভাতে কেন ভাই। প্রভাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে নিশীথে কখনইবা না? আচ্ছা, আরে ধরো ধরো।

শিগগিরই কিন্তু এসো আর একদিন। আজ ফাঁকি দিলে, আর একদিন কিন্তু আসা চাই, নইলে দারুণ ঝগড়া হয়ে যাবে। তোমার বন্ধুপত্নী এখন হেঁসেলে আছেন। আসতে পারছেন না। ছেড়ে দিচ্ছি। আরে, ধরো ধরো। আমার ছোট ছেলে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

—তোমার ছেলে?

—তাইতো শুনি। ছেলের মাতো সেই কথাই বলে।

তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলো।

বিজন বলল,—কাকা না জ্যাঠা?

—আরে দূর। জ্যাঠা আজকাল ছেলেরা হয়। ছেলের বাপ জ্যাঠারা ওসব শুনলে কানে আঙ্গুল দেয়। জ্যাঠার চেয়ে কাকাই ভালো। 'আঙ্কেল টম'।

খানিকক্ষণ বন্ধুর শিশুপুত্রের কলকাকলি শুনল বিজন। বন্ধুর প্রম্পটিংও অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল।

—কাকাবাবু এসো। কাকিমাকে নিয়ে আসবে।

—নিশ্চয়ই যাব। প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজন ফোন ছেড়ে দিল। মনে মনে ভাবল অনিমেষ আত্মজের মধ্যে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে। দেখা হলেই ছেলের কথা বলে।

কম্পাউণ্ডারকে ফোনের চার্জটা দিয়ে আর একটু কুশল প্রশ্ন,—বাড়ির সব ভালোতো রাখালবাবু ?

রাখালবাবুর মুখে ফের সেই বৈদান্তিক হাসি,—ভালো আর কই স্যার। ভালো থাকবার কি জো আছে! একপাল কাচ্চা বাচ্চা। বাড়ি থেকে অসুখ বিসুখ আর যেতে চায় না। আপনার ওসব ঝামেলা নেই স্যার। বেশ আছেন আপনি।

নিঃশব্দে বিনা মন্তব্যে বিদায় নিল বিজন। তা ঠিক, কোন ঝামেলা নেই বিজনের। ছেলে মেয়ের সুখও নেই, ছেলে মেয়ের অসুখও নেই।

হাঁটতে হাঁটতে পার্কের একটি বেঞ্চে এসে বসল বিজন। না, আসনের কোন ভাগীদার নেই আপাতত এইটুকুই সুখ। ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় এত বড় পার্কটা যেন এক বিষন্নতার চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। নাকি নিজের মনের কালিই বিজন সারা পার্কে ছিটিয়ে দিয়ে বসে আছে। কারণে অকারণে বিজনের মন যেন কেন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ছোট-খাটো ত্রুটির জন্য গ্লানির পাহাড় বুকের ওপর থেকে কিছুতেই যেন আর নামতে চায় না। সুনন্দাকে ওকথাটা না বলাই ভালো ছিল। স্ত্রী ছাড়া বিজনের আর কে আছে? স্বামী ছাড়া সুনন্দারও কেউ নেই। বোধ হয় কেউ আর আসবেও না। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা দুজনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। এ সর্তের কোন নড়চড় হবেনা। কিন্তু এক এক মুহূর্তে মনে হয় গিঁট ছেড়ার জন্যে দুজনেরই পণ যেন প্রাণ পর্যন্ত।

যুগ পালটেছে। বংশরক্ষার জন্য আগেকার মত মানুষ আর পাগল হয় না। রক্ষা না হলে মঠে মন্দিরে গিয়ে মাথা কোটাকুটি করেনা।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ধারা বদল হয়েছে। শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। যদি না পায় মেনে নেয়। বিজনও মেনে নিয়েছে। মেয়ে বলে সুনন্দার পক্ষে অত সহজে এই সন্তানহীনতাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, বিজন তা জানে। গোড়ার দিকে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে হাসি পরিহাস ও করেছে বিজন। কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের কথা তুলেছে। এ দেশে যদি যে ব্যবসায় থাকত পরীক্ষা করে দেখা যেত। বলা যায় না এই অপত্যহীনতা কার দোষে। সুনন্দা যদি রাজী থাকে সেই প্রাচীন নিয়োগ প্রথাও প্রয়োগ করে দেখা যায়। বিজনের তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

সুনন্দা বলেছে—তোমার আপত্তি না থাকাটাই সব কিনা? আমার বুঝি আর রুচি প্রবৃত্তি বলে কিছু নেই? দরকার হয় ওসব পরীক্ষা নিরীক্ষা তুমি বাইরে থেকে চালিয়ে এসো। আমার ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

তারপর স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে সুনন্দা বলেছে,—আমরা দুজন মিলে যা চাই দুজন মিলেই তা গড়তে চাই। একজনের হলে তাতে কি দুজনের মন ভরবে? তুমি বরং আর এক জনকে বিয়ে করো। আমি কিছু মনে করব না। যদি ছেলেপুলে হয়—

বিজন হেসে বলেছে,—তিনজনে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কী বলো?

তারপর সকৌতুকে পোষ্যপুত্র নেওয়ার প্রস্তাব, অনাথ আশ্রম থেকে কোন পরিত্যক্ত মানব শিশুকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দান কৌতুক রসের ভিয়েনে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করেছে দুজনে। একজন আর একজনের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়। এ নিয়ে কারোরই কোন মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু ব্যথাটাতো মাথায় নয়, ব্যথাটা বুকে। তা মাঝে মাঝে নানা ভাবেই জানান দিয়ে যায়।

বি. এ. পাশ স্ত্রীকে বিজন বসিয়ে রাখেনি। নিজে গরজ করে সরকারী অফিসে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে! কিছু একটা নিয়ে থাকুক। অফিসে সুনন্দার সুখ্যাতি হয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যে সুহৃদও নিতান্ত কম হয়নি। বিজন সব খবর রাখে। মাঝে মাঝে ঈর্ষার খোঁচা যে না খায় তা নয়, কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া তার চালচলনে আভাসে ভাষণে ধরা না পড়ে তা নয়। তবু স্ত্রীকে সে মোটামুটি স্বাধীনতাই দিয়েছে। বন্ধুবান্ধব অনেকের তুলনায় বিজন সহনশীল উদারস্বভাব। এটুকু বললে অহংকার কবা হয়না সত্যিকথাই বলা হয়।

ঘরেও আমোদ-প্রমোদের সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিজন। রেডিও আছে। গ্রামোফোন আছে, বাংলা গল্প উপন্যাসের লাইব্রেরী আছে। স্যাঁকরার দোকানে যাতায়াতও সুনন্দার নিতান্ত কম নেই। তবু ভরিল না চিও! তবু অমূল্যবাবুর ফ্ল্যাটের দিকেই টান যেন বেশি সুনন্দার। সময় পেলেই সেখানে তার ছুটে যাওয়া চাই। যতক্ষণ পারে একটি না একটি মানব শিশুর উত্তাপ তার ভোগ করা চাই। এ সুখ সুনন্দার একার। এর অংশ বিজনের পাবার জো নেই। সেই জন্যেই কি তার মনে এক ঈর্ষা! এত দ্বেষ বিদ্বেষ! নিজেকে ক্ষমা করে না বিজন, রেহাই দেয় না। মনকে খুঁটে খুঁটে চিরে চিরে দেখে। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়।

উচিত হয়নি বিজনের। শত হলেও সুনন্দা যে মেয়ে। মাতৃত্বের সংস্কার যে ওর রক্তের মধ্যে সে কথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি।

খানিক বাদে পার্ক থেকে উঠে ঘরে ফিরে গেল বিজন। দেখে খুশি হল আজ দুঘণ্টার আগেই রান্নাঘরের দোর খুলেছে সুনন্দা। রান্নাবান্নায় হাত দিয়েছে।

মান ভাঙাবার আগেই স্থনন্দা আজ কথা বলল। যদিও ছুটি চোখ ফোলা ফোলা। গলার স্বর ভারি।

—গেলে না অনিমেষ বাবুদের ওখানে ?

—না। একা একা যাই কী করে ? একটা ফোন করে দিয়ে এলাম।

—বেশ করেছ।

ছোট টেবিলের ছুধারে বসে নৈশ ভোজন প্রায় নিঃশব্দে সারল ছুজনে।

তারপর শোয়ার ঘরে এসে ছুজনে ছুখানা বই হাতে নিয়ে বসল। পড়াটা অছিলা। মুখ বন্ধ করে রাখার উপায়।

আরো কিছুক্ষন গেল। স্থনন্দার চোখ যখন ঢুলুঢুলু হয়ে এল, বইয়ের ওপর বারকয়েক ঢুলেও পড়ল, বিজন আর তখন দেরি করল না, উঠে গিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ত্রীকে আড়কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রথম যৌবনের সেই গাঢ় অনুরাগ আবার যেন ফিরে এসেছে।

স্থনন্দা আপত্তি করতে লাগল—না না না। ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু বিজন স্ত্রীর এ অনুনয় কানে তুলল না।

শেষ পর্যন্ত আগেও যেমন হয়েছে আজও তেমনি হল। স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অবুঝ বালিকার মতই খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল স্থনন্দা।

বিজন বাধা দিল না, কিন্তু সান্ত্বনা দিল। নিজের ত্রুটি স্বীকার করে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইল! তার গালে মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,—যে ছুঃখ আমাদের আছে আমরা তা একসঙ্গে সইব। কেউ আমরা কাউকে ব্যথা দেব না, আঘাত দেব না।

স্থনন্দা বলল—আমি আর যাব না অমূল্যবাবুদের ওখানে। তুমি যখন কষ্ট পাও—

বিজন বলল—কষ্ট ? ছি ছি ছি। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। যত খুশি ওদের তুমি ডাকবে, আদর করবে, কোলে নেবে। আমার ঘর ওদের জন্যে খোলা রইল।

ঘুম এল অনেক রাত্রে। সেই ঘুম যে আরো কত রাত্রে ভাঙল তা অবশ্য টের পেলনা বিজন। শুধু অনুভব করল স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনে সে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু সুনন্দার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠেছে। এত ঘাম কেন সুনন্দার ? আজতো এমন কিছু গরম নেই। তাছাড়া মাথার ওপর কম পয়েন্টে পাখাও চলছে। বিজনের বরং একটু একটু শীত শীতই লাগছে। কিন্তু সুনন্দা এত ঘামছে কেন ?

বিজনের হঠাৎ আজকের বিকালের কথা মনে পড়ল। তখনো সুনন্দা ঘামছিল। অস্বাভাবিক ভাবে ঘামছিল। সে ঘাম সুনন্দার গায়ে বিজন আরও কয়েকবার দেখেছে। বুক থেকে স্তন্য তো বেরোতে পারে না তার বদলে অতি বাৎসল্যে সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের ধারা ছোটে। ঘুমের মধ্যে কী স্বপ্ন দেখছে সুনন্দা ? সে কি এখনো একটি শিশুকেই আঁকড়ে রয়েছে ! হঠাৎ কিসের যেন একটা যন্ত্রণা বোধ করল বিজন। এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে তার মন ভরে উঠল। এর পর থেকে রোজই কি এমনি হবে ? যেহেতু স্ত্রীর কোলে সে একটি শিশু এনে দিতে পারেনি, স্ত্রীর কোলে অন্যের শিশু দেখলে শিশুর মত ঈর্ষায় জর্জর হয়েছে তাই কোন দিনই কি সে আর স্ত্রীর কাছে পুরুষের সম্মান, পুরুষের মর্যাদা পাবে না! বিজন কল্পনা করতে লাগল সুনন্দার আলিঙ্গনের মধ্যে সে যেন আকারে অবয়বে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই, আশঙ্কা নেই, লজ্জা নেই, অনুতাপ নেই, গ্লানি নেই। রাত্রির অন্ধকারে গোপন সুড়ঙ্গ পথে বিজন আবার যেন সেই মধুর শৈশবে ফিরে গেছে। মধুর মূঢ়তায় মুখে তার একটিমাত্র বুলি।



বিজন সুনন্দার কানের কাছে মুখ এগিয়ে. নিল। তারপর অর্ধ কৌতুকে অর্ধ বিদ্রূপে, অর্ধ যন্ত্রণায় অর্ধ বেদনায় একটি অস্পষ্ট অস্ফুট ধ্বনিকে ঈষৎ স্ফুটতর করে তুলল—মা, মা, মা।

ঘুমের মধ্যে মৃদু হেসে সুনন্দা গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে আরো বুকের কাছে টেনে নিল।

নিজের কাণ্ড দেখে বিজন নিজেই এবার ঘামতে শুরু করেছে।

নাবিক

শ্যালিকারা সবাই মিলে নতুন জামাইবাবুকে ঘিরে ধরল। 'দিলীপদা, আপনার জাহাজের গল্প বলুন।'

সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো শ্বশুরবাড়ির ড্রয়িং রুম। সোফাগুলি সবুজ ঢাকনিতে মোড়া। সেণ্টার টেবিলের ওপর ট্রেতে সোনালী বর্ডার দেওয়া রূপালি কাপগুলিতে পীতাভ পানীয়। জানলায় জানলায় গোলাপী রঙের পর্দা। একটি পর্দা দিলীপ ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে আকাশ দেখবার জন্যে। আকাশ দেখতে বড় ভালোবাসে দিলীপ। নীল আকাশ তাকে নীল সমুদ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

শরতের বিকালের আকাশ এখন আর নীল নয়। এখন সেখানে নানা রঙের লীলা। সেসব রঙের নাম জানে না দিলীপ। সে তো আর চিত্রশিল্পী নয়। এই বিচিত্রবর্ণ আকাশের দিকে সে শুধু তাকিয়ে থাকতে জানে। সে আকাশে কখনো নদীর ধারা বয়ে যায়। সে নদীর কোথায় শুরু কোথায় শেষ তা বুঝবার উপায় নেই। শুধু মাঝখানটুকু চোখে পড়ে। একই আকাশের পটে কখনো বা শান্ত সরোবরকে দেখা যায় কখনো বা তুঙ্গ পর্বতমালা। কখনো বা মহাকাশ ফের সেই নীল মহাসিন্ধুর আকার ধরে।

শালীদের মধ্যে একটি বি-এ পাশ করে স্কুলে কাজ নিয়েছে। আর একটি ডিগ্রী কোর্সের শেষ বছরে আছে। সবাইর সঙ্গেই মোটামুটি আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে দিলীপের।

উমা চায়ের কাপটি দিলীপের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'বলুন দিলীপদা আপনার জাহাজের গল্প।

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'কিন্তু তোমরা তো সব আদার ব্যাপারী।'

স্কুল টিচার উমা দিদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ইস অহঙ্কার দেখেছিস দিদি। আমরা যেন কিছুই জানিনে, কিছুই খোঁজ-খবর রাখিনে।'

সীমা কলেজের ছাত্রী। সমুদ্রজীবনে তার কৌতূহল আরো বেশি।

সেও রমার দিকে চেয়ে বলল, তুই বল দিদি। তুই না বললে দিলীপদা কিছুই বলবে না।'

রমা একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'বলো না। ওরা যখন অত করে ধরেছে।'

শাখা সিঁদুর পরা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে তাকায় দিলীপ। ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। বয়স তেইশ চব্বিশের কম হবে না। কিন্তু চোখ-মুখের সারল্য দেখলে মনে হয় এখনো যেন কিশোরী। ওর তুলনায় ওর ছোট বোন দুটিকে বরং বেশি চালাক, চতুর বলে মনে হয়। অবশ্য রমা কলেজের মুখ দেখেনি। দু-দুবার পরীক্ষা দিয়েও স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতে পারেনি। নার্ভাস ধরনের মেয়ে। তারপর খানিকটা দুঃখেই হোক খানিকটা অভিমানেই হোক পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। বোনদের মত গল্প উপন্যাসও বেশি পড়ে না। ওর নেশা সেলাই বোনায়। সোয়েটার বুনে আসন বুনে আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেয়। ওর হাতের বোনা আসনে বসেই ওকে বিয়ে করেছে দিলীপ। সেলাই বোনা ছাড়াও রান্না-বান্না ঘরকন্নার কাজে ওর হাত খুব পাকা। সেবায় পরিচর্যায় লক্ষ্মী। সব জেনে শুনে খোঁজখবর নিয়েই ওকে বিয়ে করেছে দিলীপ। পড়াশুনোয় একটু কম বলে আপত্তি করেনি। আসলে নরম ধরনের মেয়েই ওর পছন্দ। নম্র-শান্ত। চাল-চলনে কথায়-বার্তায় কোথাও উগ্রতা থাকবে না। তার লজ্জা থাকবে সংকোচ থাকবে। সেই হল আসল আব্রু

মেয়েদের। নিজের এই পছন্দের কথা সে দিদি বউদিদিদের বলে দিয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন অন্য আত্মীয় স্বজনকে। অনেক খুঁজে পেতে পছন্দমত কনে পাওয়া গেছে। আর পছন্দমত ঘর।

দিলীপের শ্বশুর প্রিয়গোপাল মুখুজ্যে ওকালতিতে পশার জমাতে পারেননি। ষাট পার হয়ে গেছে বয়স। এখনো ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন। কোনরকমে খেয়ে পরে আছেন। ধরন-ধারনে সেকেলে। পূজোআর্চা করেন। মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়লেও কি চাকরি করলেও অকারণে অপ্রয়োজনে বাইরে বেরোয় না। কোনরকম হৈ-চৈ হুজুগের মধ্যে থাকে না। মেলামেশার গণ্ডী তাদের সীমাবদ্ধ। রমা সেই সীমা নিজে আরো ছোট করে নিয়েছে। লেখাপড়া তেমন শিখতে পারেনি—বোধহয় সেই সংকোচ। দেখে শুনে এই কুণ্ঠিতা সংকুচিতা মেয়েটিকেই বেছে নিয়েছে দিলীপ।

উমা হেসে বলল, 'নিন। এবার তো অনুমতি পেলেন, অভয় পেলেন। এবার বলুন।'

দিলীপ স্ত্রীর দিকে চেয়ে ফের একটু হাসল, তারপর বলল, 'তা হলে ভরসা দিচ্ছ তুমি।'

ছোট শালী সীমা একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'কেন ভয়ের কিছু আছে নাকি? অমন কিন্তু কিন্তু করছেন যে?'

দিলীপ বলল, 'ভয়ের আবার কী থাকবে। এখন তো নোঙর ফেলেছি। বন্দরে এসে পৌঁছেছি।'

খানিকটা দূরে দিলীপের আর এক ভায়রা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাইপ টানছিলেন। আর ছবিওয়ালা পুরোন একটা ইংরেজী মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সেলরদের ভয় বুঝি শুধু রাফ সি তে? বন্দরে বুঝি কোন ভয় নেই?'

নিশীথ চক্রবর্তী দিলীপের আপন ভায়রা নন। রমার মাসতুতো

বোনকে বিয়ে করেছেন। সে বোন রমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। নিশীথবাবুও চল্লিশ পেরিয়েছেন।

বাড়ি আছে নিজের শোনা যায়, শেয়ার মার্কেটে ঘোরাফেরা করেন। অভিজ্ঞ বিচক্ষণ মানুষ বলে সহজেই চেনা যায়।

তাঁর কথায় উমা আপত্তি করে বলল, 'আপনি আবার এ ব্যাপারে আসছেন কেন জামাইবাবু? ছেলেবেলা থেকে এই তো চড়কডাঙায় পড়ে আছেন। জাহাজের আপনিই বা কী জানেন! কখনো উঠেছেন আপনি?'

নিশীথবাবু হেসে বললেন, না। এ বাড়িতে আমার আর কোন পশার রইল না।

দিলীপ আস্তে আস্তে শুরু করল। বি এস সি ফেল করে সে হতাশ হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাবার তিরস্কার, দাদাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ক্রমেই একটা ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠছিল তার। দেশের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা। পৃথিবীটা একটু ঘুরে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছেলেবেলা থেকেই তাকে পেয়ে বসেছিল। স্থলপথ কি আকাশপথের চেয়ে জলই তাকে বেশি টানত। এই আকর্ষণ যে কোত্থেকে এসে-ছিল কে জানে। বোধহয় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলায় সেই যে জাহাজ দেখত তখন থেকেই ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসেছে।

তাই বোম্বে যাওয়ার ভাড়াটা জোগাড় করে নিয়ে সে পাড়ি দিল। ছেলেবেলা থেকেই গান বাজনার দিকে বেশ একটু ঝোঁক ছিল। অল্প-স্বল্প গাইতে পারে তবলায় ঠেকা দিতে পারে। শুধু গীটারটা শিখে-ছিল আর একটু বেশি যত্ন করে। বাড়ির সবাইর ধারণা এই গান-বাজনার জন্যই পড়াশুনো হয়নি। চাকরি কিন্তু এই গান-বাজনার জন্যেই হয়। এক ন্যাভাল ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী তাঁর গান শুনে খুশি

হলেন। গীটার শুনে আরও মুগ্ধ। তাঁর সুপারিশে চাকরি হল। প্রথমে ছোট চাকরি। খালাসীদের একটু উপরে। তারপর আস্তে আস্তে উন্নতি হল। শিখে নিল রেডিও ওয়ারলেস। চান্স পেল ছোট জাহাজ থেকে বড় জাহাজে। জাহাজটা যুদ্ধ জাহাজই। যদিও যুদ্ধ কখনো করতে হয়নি। মাঝে মাঝে শুধু মহড়া দিতে হয়। বছর দশেক হতে চলল চাকরি। দশ বছরে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই সে ঘুরেছে। ইওরোপ আমেরিকায় যেমন গেছে তেমনি গেছে চীনে জাপানে। যেমন দেখেছে বিচিত্র প্রকৃতি, তেমনি বিচিত্র মানুষ। বাইরে না গেলে কোন অভিজ্ঞতাই হয় না। বিদেশে না গেলে নিজের দেশকেও চেনা যায় না ভাল করে।

দিলীপ থামল।

মা ডাকলেন ভিতর থেকে। সবাইর আগে রমা উঠে চলে গেল। উমাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই কি হচ্ছে দেখি গিয়ে। দিদিকে তো এখন আর বেশি খাটানো যায় না। ও এখন অন্য বাড়ির মানুষ।'

সীমাও দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'যাই হিস্ট্রিটা একটু দেখতে হবে। কাল আবার পরীক্ষা আছে। সবিতাদির এত পরীক্ষা নেওয়ার বাতিক।'

দিলীপ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হল। বুঝতে পারল নৌ-জীবনের বর্ণনায় সে ওদের আকর্ষণ করতে পারেনি। ওরা যে উৎসাহ যে আগ্রহ নিয়ে শুনতে এসেছিল তার চেয়ে বেশি নৈরাশ্য নিয়েই ফিরে গিয়েছে। দিলীপ মনে মনে বলল, 'আমি বলতে পারিনে। গানের গলা আর গল্পের গলা এক নয়।'

নিজে দেখা আর অন্য কাউকে দেখানো ভিন্ন বস্তু। দিলীপ চুপ করে রইল। অথচ বলবার মত কত কথাই ছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সঙ্গে সে কাজ করেছে—পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী মাদ্রাজীদের নানা রকমের চেহারা, পোশাকআসাক, খাদ্য রুচি।

কারো মাংস না হলে চলে না, কারো মাছ মাংসের গন্ধে বমি আসে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঈর্ষা হিংসা, মিলন কলহের কথা বলতে পারত। হংকং-এ একবার সাইক্লোনের মধ্যে পড়েছিল, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল সেইসব অ্যাডভেঞ্চারের কথা শোনানো যেত। আবার কত অবিস্মরণীয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখেছে, পূর্ণ চাঁদ দেখেছে আকাশ আর সমুদ্রে জ্যোৎস্নার প্লাবন উপভোগ করেছে সে সবও বর্ণনা করতে পারত। আসলে যত বিচিত্র জায়গা সে দেখেছে, এতগুলি বছর ধরে যত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার হয়েছে সব যেন মাঝে মাঝে কেমন তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যায়। যেন দেখা না দেখা সমান হয়ে পড়ে। কোন বিশেষ উপলক্ষ্য না ঘটলে প্রসঙ্গ না তুলে ধরলে কিছুই মনে পড়ে না। এত দেশ দেশান্তর বেরিয়েছে, এত সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরেছে, এত শহর বন্দরের হোটেলে কাটিয়েছে, কিন্তু কত সামান্য অংশই না দিলীপের মনে আছে। কত সামান্য চিহ্নই না তার মন ধরে রেখেছে। এ যেন নিজের জীবন কাহিনী নয় সাধারণ কোন ঔপন্যাসিকের লেখা কল্পিত কাহিনী। পড়বার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রায় সব ভুলে যেতে হয়। গল্পাংশের ক্ষীণ অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু মাত্র থাকে।

অবশ্য প্রচুর ফোটো তুলেছে দিলীপ, সমুদ্রের ফোটো, বন্দরের ফোটো, পাহাড়-পর্বতের ফোটো। কিছু কিছু আত্মীয়-বন্ধুদের উপহার দিয়েছে। কিছু নিজের কাছে আছে। সেই ফোটোগুলিই দিলীপের দেশ ভ্রমণের প্রমাণ আর অভিজ্ঞান। উমা-সীমারা ফের যখন দিলীপদের কারবালা ট্যাঙ্ক রোডের বাড়িতে যাবে সেই অ্যালবামগুলি ওদের হাতে তুলে দেবে দিলীপ। সেইগুলিই হবে তার সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী।

আকাশের বর্ণশোভা সন্ধ্যার আঁধারে মিলিয়ে গেছে। কে যেন আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে ঘরে। নিশীথবাবু তার দিকে তাকিয়ে

হেসে বললেন, কি হেরু কথক ঠাকুর। যারা গালে হাত দিয়ে ব্রতকথা শুনতে বসেছিল তারা যে উঠে চলে গেল।'

দিলীপ বলল, 'গেলে আর কী করব বলুন ?'

নিশীথবাবু বললেন, 'যাবে না কি করবে। গল্প না বলে তুমি গল্পের সারাংশ বলছিলে। আসলে কিন্তু সার আর অসারে মিলিয়েই গল্প। আমিও কান খাড়া করে ছিলাম হে। ভাবছিলাম দুটো রসের কথাটথা শুনব।

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'কিন্তু নিশীথদা, মেয়েদের সামনেতো তো সব কথা বলা যায় না।'

নিশীথবাবু নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। এগিয়ে এসে দিলীপের একেবারে সামনে বসলেন। তারপর নিচু গলায় অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ ভায়া। মেয়েদের সামনে মেয়েদের কথা কক্ষণো বলতে নেই।'

দিলীপ লজ্জিত হয়। তারপর একটু সতর্ক হয়ে বলল, 'আমি সে কথা বলছিনে।'

নিশীথবাবু বললেন, 'তুমি কি বলছ না বলছ আমি বুঝতে পেরেছি। দেখ ভাই আমি জাহাজে চড়িনি বটে, কিন্তু ঘাটে ঘাটে কম ঘুরিনি। চামড়ায় একটু আঁচড় দিয়েই বুঝতে পারি কে কোন ধাতের মানুষ।'

দিলীপ বলল, 'আপনি তো দেখছি তাহলে সবজান্তা।'

নিশীথবাবু হেসে বললেন, 'না আমি সবজান্তা নই। সব জানবার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি শুধু দু-একটি কথা তোমার কাছে শুনতে চাই। যদি সাহস থাকে সত্যি জবাব দাও। না হলে স্বীকার করে বলো সাহস নেই।'

তাঁর কথার ভঙ্গিতে দিলীপের রক্ত একটু গরম হল। বয়স এখনো তিরিশের নিচে। ধাতটা যত ঠাণ্ডাই হোক যখন তখন ব্যঙ্গ বক্রোক্তি

সহ্য হয় না। দিলীপ বিরক্তিটুকু গোপন না করে বলল, 'বলুন কী শুনতে চান আপনি।'

নিশীথবাবু উঠে গিয়ে অন্দরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। সদরের দরজা ভেজানোই ছিল। তারপর ফের এসে দিলীপের সামনে বসে হেসে বললেন, 'চটো না ভাই। আমাদের সম্পর্ক মধুর সম্পর্ক ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। কিন্তু ভায়রা ভাইদের মধুর হাড়ি একই বাড়িতে। আমি জানতে চাই জাহাজে কাজ করতে গিয়ে তুমি কতখানি বামুনের শুচিবাই বজায় রেখেছ। পাঁজির শাসন কতটুকু মেনেছ, কতখানি মানো নি।'

দিলীপ বলল, শাসনটাসন বলতে আপনি কী বোঝাতে চান?'

নিশীথবাবু মুখ টিপে হাসলেন, 'আমি যা বোঝাতে চাই তুমি তা ঠিকই বুঝেছ। দেখ তোমার ওসব যন্ত্রপাতি ওয়ারলেস-ফোয়ার-লেসের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারব না। তোমার ওই নৌ-বিদ্যায় আমার কোন আগ্রহ নেই। তুমি যা দশ বছরে শিখেছ আমি তা দশ মিনিটে শিখে নেব এমন প্রতিভার গর্ব করিনে। আমি শুধু তোমার আহার বিহার সম্বন্ধে—'

দিলীপ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। আপতি এত বিচক্ষণ মানুষ কিন্তু এই অতি সাধারণ ব্যাপারে আপনার এমন অসাধারণ কৌতূহল কেন?'

নিশীথবাবু ফের একটু হাসলেন, 'তুমি এবার খানিকটা গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিলে ভায়া। আসলে আমি অসাধারণ নই, নিতান্তই সাধারণ। খাওয়া পরা শোওয়া বসা, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই আমার কারবার। অতি তুচ্ছতার সুখ, অতি তুচ্ছতার দুঃখের সমুদ্রে ডুবে আছি ভায়া। তোমার গোপন কথা তুমি যদি বলতে না চাও বোলো না। কিন্তু ওই গুহ্য ব্যাপারটা বন্ধু

বন্ধুর কাছে খুলে ধরবে তাই মানুষ আশা করে। ওই গুহ্য ব্যাপারটাই সংসারে সবচেয়ে সহজগ্রাহ্য।'

দিলীপ একটু চুপ করে থেকে সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, 'গুহ্য ব্যাপারের আর কী আছে। বীফ টিফ খেয়েছি।'

'খেয়েছ? বাঃ বাঃ। ও বস্তু খাওয়ার জন্যে অবশ্য জাহাজে চড়তে হয় না। ডাঙায় বসেও খাওয়া যায়!'

দিলীপ বলল, 'তবু ডাঙার খাওয়া আর জলের খাওয়া আলাদা।'

নিশীথবাবু উল্লসিত হয়ে বললেন, 'বটেই তো বটেই তো। তারপর? শুধু কি বীফই?'

দিলীপ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'দেখুন, দেখে দেখে আমার মনে হয়েছে সবই আসলে সংস্কার। সবই অভ্যাস। আয়ত্ত করতে মানুষের কত কম সময়ই না লাগে। রাডার অপারেটিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে আমাদের তেওয়ারী। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। টিকি আছে পৈতে আছে। ঘরে বউ ছেলে আছে। গোড়ায় গোড়ায় কী নিষ্ঠাই না তার ছিল। আমরা তাই নিয়ে সবাই তাকে ঠাট্টা করতাম। মাছমাংস ছোঁবে না। নিরামিষ ছাড়া কিছু খাবে না। তার মরালাইজিং এর চোটে আমাদের দু' কান ঝালাপালা। কিচেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সবাই মিলে আমরা তার শোধ নিলাম। নিরামিষ ঝোল বলে ওকে আমরা মাংসের সুপ খাইয়ে দিলাম। তারপর শর্মা দিল কথাটা ফাঁস করে। শুনে তেওয়ারী তো বমি করে করে মরে আর কি। আমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, 'চ্যাটার্জি, ওরা আমার জাত মেরেছে।'

নিশীথবাবু বললেন, 'তারপর?'

দিলীপ বলল, 'আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, জাতটা তোমায় ওই মাংসের ঝোলের মধ্যে নেই তেওয়ারী। ধর্মটাও না।

তুমি এখন সমুদ্রে এসেছ, সমুদ্রের মত উদার হও। বেশি বলতে হল না, সেই তেওয়ারী দেখতে না দেখতে কী বদলেই না গেল। মাংস খেল, মদ ধরল আর মালটায় নেমে যে কাণ্ডটা করল—'

নিশীথবাবু বললেন, 'কী করল?'

দিলীপ বলল, 'মাল টানার সঙ্গে সঙ্গে সেলররা যা করে তাই আর কি। অবশ্য জাহাজে তো ও সব কিছু পাওয়া যায় না। সেখানে খুব কড়াকড়ি। কঠোর ডিসিপ্লিনের ব্যাপার। কিন্তু পোর্টে নেমে এসে সেলরদের কিছুদিনের জন্যে অবাধ স্বাধীনতা। তাই পোর্টে নামবার জন্যে তারা যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম সমুদ্র বেশ ভালো লাগে। ভেসে যাচ্ছি তো ভেসেই যাচ্ছি। কূল নেই, কিনারা নেই। এই অবাধ নিঃসীমতার মধ্যেই যেন মুক্তি। তারপরই মাটির জন্যে প্রাণ অস্থিব হয়। জল ছাড়া মাছ বাঁচে না, মাটি ছাড়া মানুষ বাঁচে না। মাটি তো শুধু মাটিই না, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু জড়ানো আছে।'

নিশীথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, যথা?

দিলীপ বলল, 'হাটবাজার, দোকান-পাট, কাপড়-চোপড় কত রকমের কত জিনিস। সেল"রা প্রাণভরে খায়, স্ফূর্তি করে কিনে-কেটে। তারপর কেউ কেউ অজানা-অচেনা মেয়েদের পায়ে সব ঢেলে দিয়ে খালি হাতে জাহাজে ফিরে আসে। মালটায় আমাদের তেওয়ারীরও সেই দশা হয়েছিল।'

নিশীথবাবু বললেন, 'আর কতক্ষণ পরস্মৈপদী চালাবে ভায়া, এবার আত্মনেপদী ধরো। তেওয়ারীর ব্যাপারে আমার কোন ইনটারেস্ট নেই। তুমি কী কাণ্ড করেছিলে আমি তাই জানতে চাই।'

দিলীপ বলল, 'না, মালটায় আমার কিছু হয়নি। মেডিটেরনি মধ্যে সেই ছোট দ্বীপটি আমার অবশ্য খুব ভালো লেগেছিল। বন্দরটি বেশ। রাস্তাঘাট সবই সুন্দর। আমি সারাদিন একা একা বেড়াতাম।

কোন কোন দিন গাড়ীটা নিয়ে নিজের মনে একটা গাছতলায় বসে যেতাম।

নিশীথবাবু বললেন, গাড়ীটা বুঝি সঙ্গেই নিয়েছিলেন!

দিলীপ বলল, নিজের কেনা নয়। সেই ন্যাভাল অফিসারের স্ত্রীর প্রেজনটেশন। জাহাজের সঙ্গীরা আমার বাজনা শুনে খুশি হত। শান্ত সমুদ্রেও বাজাতাম, অশান্ত সমুদ্রেও বাজাতাম। কিন্তু জাহাজে ওরা শুনলে কি হবে পোর্টে নেমে ওসব আর আর ওদের ভালো লাগত না। ওরা তখন ছুটত বারে, ছুটত ব্রথেলে। একদিন সন্ধ্যার পর তেওয়ারী বর্মা আর তালুকদার আমাকে একটা বারে ধরে নিয়ে গেল। শহরের মধ্যে বেশ রেসপেকটেবল বার। আরো দুটো জাহাজের সেলররা এসেছে। সবাই খেল, স্ফুর্তি করল। তারপর এক একটি মেয়ে নিয়ে যার যার ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

'একেবারে চুপ চাপ?'

'চুপ চাপ থাকবার কি আর জো আছে? দু'তিনটি মেয়ে এসে একেবারে গা ঘেঁসে বসে বিরক্ত করতে লাগল। মালটীজ গার্লদের খুব খ্যাতি আছে। খুব স্বাস্থ্যবতী সেকসি চেহারা। বেশ-বাস যৎসামান্য। তারা আমার ভাবসাব দেখে হেসেই অস্থির। Don't you like women? ভাঙা ভাঙা ইংরেজী। ওরা যেন আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়। মেয়েদের পছন্দ করিনে, একথা কি করে বলি। কিন্তু ওদের ধরণ-ধারণ আমার তেমন ভালো লাগলো না। হয়তো ভয়, হয়তো সংস্কার। অজান্তে মাংসের স্যুপ খেয়ে তেওয়ারীর একবার যে অবস্থা হয়েছিল কিছু না খেয়েও আমার তেমনি গা বমি বমি করতে লাগল। মেয়েদের হাসিঠাট্টা শুনতে শুনতে আমি বার থেকে বেরিয়ে এলাম।'

নিশীথবাবু হেসে বললেন, 'খুব হোয়াইটওয়াস করা হচ্ছে।'

'না হোয়াইট-ওয়াসের কিছু নেই। শুনুন। বলছি সব। মালটায় কিছু হল না, জিব্রালটারেও কিছু হল না। জিব্রালটারের রকের কথা শুনেছেন তো? চাঁদের আলোয় সেই রক দেখলাম। অপূর্ব। রকের মতোই অটুট থেকে জাহাজে উঠলাম।'

'তারপর?'

'তারপর ঘুরে ঘুরে আমাদের জাহাজ লিভারপুলের বন্দরে ভিড়ল। সেখানে দিন পনের ছিলাম আমরা। শহরের ওপরে একটা ফ্ল্যাটে থাকবার পারমিশন পেয়েছিলাম। বেশ বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটি। অগুণতি লোকজন কল-কারখানা। কিন্তু সেখানে আমি যে জন্যে সমাদর পেলাম তার মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রির কিছুই নেই। সেখানে বাঙালী আছে, ইণ্ডিয়ার অন্যান্য জায়গার লোকজনও তো আছে। তাদের একটি এসোসিয়েশনও রয়েছে। তারা কি করে টের পেল আমি একটু বাজাই টাজাই। গান বাজনার আসর করে বসল। আমাকেও বাজাতে হবে। আমাদের জাহাজের খালাসী থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন কমাণ্ডার পর্যন্ত সবাই গর্বে অস্থির। আমার তো ভয়ে বুক দুরু দুরু। বাজাই আমি নিজের জন্যে। সবাইকে শোনাবার মত বাজাইনে। নিজের ফ্ল্যাটে বসে যতদূর পারি রেওয়াজ করি। কিন্তু রেওয়াজ করব কি হাত চলেনা। দারুণ শীত। জানুয়ারী মাস। আঙুল অবসন্ন হয়ে আসে। তখন বর্মারা বলল, চ্যাটার্জি অ্যালকোহল ছাড়া তোমাকে কিছুই আর গরম রাখতে পারবে না। খেয়ে নাও। বাবা মা দিদিদের কাছে যে সব প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম সেগুলি আর বজায় রাখা গেল না। খেতে হল। এই প্রথম। আমি রেওয়াজ করি আর একটি মেয়ে আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ইংরেজ মেয়ে। আমাদের বাড়িটার ফার্স্ট ফ্লোরে ওরা থাকে। লক্ষ্য করেছি। এমন কিছু চেয়ে দেখবার মত মেয়ে নয়। মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত তো নয়ই। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখি ও

আমার মধ্যে কী দেখল ও আমার বাজনায় কী শুনল। একদিন এল এক অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে। বলল, তোমার সই দাও। অবাক কাণ্ড। আমি হেন মানুষ, আমার আবার সই। তবু অমন আগ্রহ উপেক্ষা করা যায় না। শীতে আমাব আঙুল তখন কুঁকড়ে আসছে। তবু দিলাম সই করে। একবার ওর ভাষায় একবার আমার ভাষায়। তারপর দুই ভাষা মিলে এক হয়ে গেল।

ফাংসনে আমার বাজনা সেবার সবাই ভালো বলেছিল। অত ভালো যে কেন হয়েছিল সে আমিই জানি। লিভারপুলে তারপর আরো সপ্তাহখানেক ছিলাম। সে একদিনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি। কিন্তু জাহাজে যারা কাজ করে তাদের এমন অনেক বন্দরে অনেককে ছেড়ে আসতে হয়। আসার দিন সে খুব কেঁদেছিল। জাহাজঘাটে এসেছিল বিদায় দিতে।'

দিলীপ চুপ করে রইল। জেটির ওপরে অশ্রু ছলছল একখানি মুখ বহুকাল পরে ফের তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

নিশীথবাবু বললেন, 'সেই প্রথম ?'

দিলীপ অস্ফুট প্রতিধ্বনি করে বলল, সেই প্রথম।,

'তারপর ?'

তারপর আর কিছু বলবার সুযোগ হল না। দিলীপের শ্বশুরমশাই এসে পেঁাছলেন। কোর্ট থেকে এক মক্কেল গাড়ি করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে এক জরুরী মুসাবিদা ছিল। তাই ফিরতে দেরী হয়ে গেছে।

শাশুড়ী ঠাকুরুন বকতে লাগলেন, 'তোমার কী আক্কেল। অমনিতে তোমার কাজকর্ম থাকে না। আর আজ একেবারে কাজের জোয়ার এল।'

খাবার টেবিলে বসে দিলীপ লক্ষ্য করল সবাইর মুখ ভার। ধারে কাছে রমার দেখা নেই। উমা মায়ের সঙ্গে পরিবেশনে লেগেছে।

সীমা জামাইবাবুর পাশে বসেছে খেতে। কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে গল্প চলে তা তেমন জমে উঠছে না।

অমন যে বাকপটু নিশীথবাবু তিনিও হার মানলেন। শ্যালিকাদের কাউকে তেমন করে সুহাসিনী সুভাষিণী করে তুলতে পারলেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে নিশীথবাবু আর দেরি করলেন না। ট্যাকসি করে তাড়াতাড়ি চড়কডাঙায় চলে গেলেন। তিনি একাই এসেছেন নিমন্ত্রণ রাখতে। শরীর খারাপ বলে স্ত্রী আসেন নি।

আরো খানিকক্ষণ বাদে শ্যালিকারা শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিল। বাড়িতে ঘরের টানাটানি, শ্বশুরমশাই তাঁর ঘরখানাই আজকের মত জামাইকে ছেড়ে দিয়েছেন।

পুরোন ঘর পুরোন শয্যা। কিন্তু দম্পতি নতুন। বড় খাটখানা জুড়ে বিছানা পাতা হয়েছে। নতুন চাদর। ফুল তোলা বালিশের ঢাকনিগুলি নিশ্চয়ই রমার হাতের তৈরী।

টেবিলের ওপর ফুলদানীতে গন্ধরাজ। সবুজপাতা সমেত এনে রাখা হয়েছে। ঘরখানি গন্ধে ভরে উঠেছে।

আর একটি তাকে ছোট ছোট দুটি ময়ুর। বিচিত্র রঙের কৃষ্ণনগরের পুতুল। আসলে ধূপদানি। সরু সরু ধূপের কাঠি উঠেছে। ময়ূর ময়ূরীর পিঠে। ধূপ পুড়ছে। গন্ধে ঘর সুরভিত।

কোন কারণ নেই। তবু দিলীপ কেমন একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। একখানি বই তুলে নিল হাতে। প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। শ্যালিকাদের কেউ রেখে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু রমা আসছে না কেন? ব্যাপার কি? ওর কি খাওয়া-টাওয়া হয় নি এখনো?

খানিকবাদে বোনেরা যেন প্রায় জোর করেই ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। আশ্চর্য আজও কি ওর সংকোচ যায় নি? দ্বিরাগমনের পরেও আগমনে ওর এত দ্বিধা?

শেষ পর্যন্ত রমা এল। দোর বন্ধও করল। শাড়িতে এখন আর প্রবালের রঙ নেই। সাদা পালের রঙ। পাড়টি শুধু নকসিকাটা।

দিলীপ বলল, 'এসো।' তারপর হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেল।

কিন্তু রমা ধরা দিল না।

সামনে এসে চুপ করে দাঁড়াল। শান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী। একটু লম্বাটে ডৌল। ভারি মিষ্টি। প্রতিমার মত আয়ত চোখ। কিন্তু চোখ দুটি আজ বড় বিষণ্ণ।

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'কী হল তোমার। বোসো।

বসল রমা। বিছানায় স্বামীর সামনে বসল।

তারপর নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে একটি কথা সত্যি করে বলবে?'

ওর মুখের হাসি দেখে নিঃশঙ্ক হল দিলীপ। হেসে বলল, 'বলো।'

'লিভারপুলের সেই মেয়েটিব নাম কী?' হাসতে লাগল রমা। কিন্তু হাসি এল না। কাজল কালো দুটি চোখ জলে ভরে এল।

দিলীপ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। ঠিক করতে পারল না কে এই মিসচিফ্‌টি করেছে। ওরা নিজেরাই কি আড়ি পেতেছিল? না নিশীথবাবুই এই দুষ্কর্মটি করে গেছেন?

দিলীপ হেসে বলতে চেষ্টা করল, আরে তুমিও যেমন। ওসব কি সত্যি নাকি? আমি গল্প করছিলাম নিশীথদার কাছে। তিনি বললেন কিনা, তুমি গল্প বলতে জানো না। তাই—'

কিন্তু রমা অধীর আবেগে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল, না না! আমার কাছে আর মিথ্যে কথা বোলো না। আমায় ভুলিও না। আমি তো আর কাউকে ভালোবাসি নি কারো দিকে চেয়েও দেখি নি। কিন্তু তুমি—কিন্তু তুমি—'

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল রমা। কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

ডাঙার জীবন আর জলের জীবন এক নয়।

দিলীপ ভাবল, নিশীথদার প্ররোচনায় কী বোকামীই না করে ফেলেছে। তখন সে যেন সব ভুলে গিয়েছিল। জাহাজ, সমুদ্র দ্বীপ আর বন্দর তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। সে যে শ্বশুর বাড়ির একটি ঘরে বসে আছে তা মনে ছিল না। নীল সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে স্মৃতি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সে কেবল ডুবছিল আর ভাসছিল, ডুবছিল আর ভাসছিল।

এখন এই অবুঝ স্ত্রীকে সে কী করে শান্ত করে। বড় বিপন্ন বোধ করল দিলীপ। একটু আগে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই ছিল সমস্যা। এখন ওর কাছে সবই বিশ্বাসের অযোগ্য করে তুলতে হবে। পারা বড় কঠিন। ওর কষ্ট দেখে বড় মমতা হল দিলীপের।

ভারি নরমজাতের মেয়ে। দেখে বড় মায়া হয়। ওকে আর কক্ষণো কষ্ট দেবে না দিলীপ।

কিন্তু—কিন্তু সে কি করে সমুদ্রে না গিয়ে পারবে? নোনা জল যে রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বর্ণবহ্নি

সকালে আজ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশ ছিল না। সময়টা হাতে পেয়ে নিজেই রেয়াজ করতে বসেছিল রঞ্জন। রেডিওতে রেকর্ডিংয়ের সময় এগিয়ে এসেছে। হাতে কদিন মাত্র বাকি। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক একটানা রেয়াজের পরেও তার মনে হয় ঠিক আশানুরূপ হচ্ছে না। অথচ সেতারটিকে সেদিন জোয়ারী করে এনেছে, যন্ত্রটি বাঁধার কোন ত্রুটি হয়নি।

কিন্তু মনোযন্ত্র ঠিকমত বাঁধা হচ্ছে না।

কিছুদিন ধরে কী যে হয়েছে তার মনের, মনই জানে। কিসের যে একটা খুঁতখুতি, অসন্তোষ, অনিচ্ছা, বীতস্পৃহা- মনের মধ্যে লেগে আছে রঞ্জন বুঝে উঠতে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে সময়টা বন্ধ্যা যাচ্ছে। সময়টা তার সৃষ্টির কাজে লাগছে না। সুরসৃষ্টির কাজ। সৃষ্টির মধ্যে সেই তন্ময়তার অভাব অনুভব করছে রঞ্জন। সুর-সাধনায় সেই আনন্দ যেন আর নেই। তবে কী চায় মন? সঙ্গীত ছাড়া সে আর কোন বস্তুকে ভাবতে পারে না যা তাকে বেশি আনন্দ দেয়, কি ভবিষ্যতে বেশি আনন্দ দেবে।

রঞ্জনের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের অভাব নেই। কিন্তু কারো কাছেই এই অতৃপ্তির কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারে না রঞ্জন। সেখানে বললে কেউ বুঝবেও না।

বাইরের দিক থেকে কোন বৈলক্ষণ তার শরীরে কি আচার-আচরণে ধরা পড়ে না। তার শরীর সুস্থ আছে। আর্থিক সঙ্গতি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এখন তার যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী।

বাইরের অনুষ্ঠানে বাজাবার জন্যে মাঝে মাঝে ডাক আসে। আগের চেয়ে দক্ষিণার অঙ্ক বেড়েছে। রঞ্জন নিশ্চয়ই ধনী নয়। তবে যা সে উপার্জন করে তাতে নিজের প্রয়োজন মিটে গিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে তার যা দেয় তার অতিরিক্তই সে এখন দিতে পারে। তাছাড়া গান-বাজনার লাইনে এমন কিছু কিছু লোকজন আছেন যাঁরা অসুস্থ-অশক্ত অথচ এক সময় গুণী শিল্পী ছিলেন—গোপনে তাঁদেরও কিছু কিছু সাহায্য করতে হয়। কেউ ধার বলে নেন, আর ফেরত দিতে পারেন না। কেউ বা একান্ত অভাব-অনটনের কথা বলে চুপ করে থাকেন। শুধু মুখের সহানুভূতি কোন কাজে লাগে না তাই যথাসাধ্য কিছু দিতেও হয়। সে-দান নিতান্তই সামান্য। তবু রঞ্জনের পক্ষে তা নেহাত সামান্য নয়। তা ছাড়া এসব গোপন দান-ধ্যান—পাঁচ টাকা দশ টাকা যাই হোক না কেন, এরও তো একটা গড় আছে!

বাইরে থেকে যে যাই ভাবুক, অর্থের প্রাচুর্য নেই। তবু অর্থের ভাবনাটাই বড় ভাবনা নয়। তবে কি যশ? মনের কোন একটা স্তরে সেই আকাঙ্ক্ষা আর অপূর্ণতার জন্য ক্ষোভ আছে বই কি! তার সমবয়সী এমন কি তার চেয়ে কমবয়সী কোন কোন যন্ত্রী সঙ্গীত-জগতে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেউ কেউ প্রচুর বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে আধুনিকতম আসবাবপত্র। রঞ্জন তাদের ব্যবহার জানে না। কোন কোন বস্তুর নামও শোনে নি। এই সব শ্রুতকীর্তি শিল্পীদের তুলনায় রঞ্জন যেন নিতান্তই পাড়ার একজন বাজিয়ে মাত্র। এই ক্ষোভ এই নিভৃত নীরব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বাস্তব কৃতিত্বের মধ্যে যোজনপ্রমাণ ব্যবধানের কথা মনকে স্পর্শ করবে না এমন নিরাসক্ত মোহহীন রঞ্জন হতে পারেনি। অর্থ কিছু নয়, যশ কিছু নয়, একথা সে জোর গলায় বলতে পারে না। তাই বলে সঙ্গীত-সাধনায় যশ আর অর্থই পরমার্থ, একমাত্র অভীপ্সিত বস্তু,

এ কথাই বা সে স্বীকার করে কী করে? সারা জীবনের সঙ্গীত-সাধনায়—সাধনা বড় কথা—চর্চা কি অনুশীলন বলাই ভালো, সেই অনুশীলনের ভিতর দিয়ে জীবনে এমন স্বাদ কি পায়নি রঞ্জন যা অর্থের কথা ভুলিয়ে দেয়, যশের কথা ভুলিয়ে দেয়, এই ব্যবহারিক জগতের বহু মূল্যবান বস্তুই যে পরম প্রাপ্তির কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়? পেয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে পেয়েছে। যারা মহৎ সাধক, মহৎ শিল্পী, তারা সেই প্রাপ্তির মধ্যে বাস করেন। আর যারা ক্ষুদ্রতর, তারা ক্ষণে ক্ষণে পায়, ক্ষণে ক্ষণে হারায়। তবু তাদের সেই প্রাপ্তিটুকু মিথ্যা নয়, মায়া মরীচিকা নয়।

ভেজানো দরজা ঠেলে কে যেন এসে ঘরে ঢুকল। রঞ্জন চোখ তুলে তাকাল। রীণা, তার ভাইঝি। সাত-আট বছরের মেয়ে। এরই মধ্যে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। কালো রঙের ওপর বেশ সুশ্রী চেহারা। কোঁকড়ানো চুল নেমেছে কাঁধ পর্যন্ত।

রীণা বলল, 'কাকু তোমার জন্যে যে এক ভদ্রলোক বসে আছেন।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'ওমা তাই নাকি? কোথায় বসে আছেন?'

'বাইরের ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।'

রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন এটা তার ভালো লাগে না। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনলেই সে নিজের কাজ ফেলে আগে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। এতে বাড়ির সবাই তার ওপর অসন্তুষ্ট। মা, দাদা, বউদি ভাইরা সকলেই তাকে এই নিয়ে বকাবকি করে। 'তুমি আর্টিস্ট মানুষ, তোমার সময়ের দাম আছে। সংসারের কিছু তোমাকে করতে হয় না, আমরা তোমাকে কিছু করতে দিইও না। কিন্তু তুমি নিজের সময়ের মূল্য বোঝ না, নিজের মূল্যও বোঝ না। যে আসবে তার সঙ্গেই তুমি যদি দেখা-সাক্ষাৎ কর, গল্প করতে যাও, তাহলে

তুমি কাজ করবে কখন ?' কখনো কখনো প্রিয়জনদের এই হিতৈষণায় রঞ্জন নিজের মনে হাসে। নিজের কাজের সময় সে নিজে জানে। সে জানে কাজে বসলেই কাজ করা যায় না। তার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চাই। মনের মধ্যে তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা চাই। কাজে বসেও নিজেকে নিজে ফাঁকি দেওয়া যায়।

আবার কোন কোন সময় সে আত্ম-সমালোচনা করতেও ক্ষান্ত হয় না। আগের চেয়ে সত্যিই কি তার নিষ্ঠা কমে গেছে ? নিজের শিল্পসৃষ্টির প্রতি তার সেই মমতা আর আনুগত্য কি আর নেই ? তাকে কি এখন অন্য কিছু বেশি আকর্ষণ করে নেয় ? সূক্ষ্ম তারযন্ত্র নয়, স্থূল জীবন ? লোকজন, সামাজিকতা, প্রণয়, বন্ধুত্ব ? মানুষের সঙ্গে মানুষের সহস্র রকমের বন্ধন ? এই কি তার শিল্পসৃষ্টির নতুন মাধ্যম ?

কিন্তু রঞ্জন তীব্রভাবে এ কথা অস্বীকার করে। না, না, তা হতে পারে না। তার সঙ্গীত সব কিছুর উপরে। সঙ্গীতের জন্যে সে তরুণ বয়স থেকে অনেক কিছুই করেছে। নিজের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে তাকায়নি, ভালো ভালো চাকরি পেয়েও নেয়নি, জীবনের অনেক ভোগ সুখকে বর্জন করেছে। সংসারের বাড়তি দায়িত্ব যাতে কাঁধে না চাপে তার জন্যে বিয়ে করেনি। সে কি শুধু অর্ধপথে এসে থেমে যাবে বলে ? কিছুতেই নয়।

ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর পার হয়ে বাইরে বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল রঞ্জন। যে ভদ্রলোক সোফার ওপর বসেছিলেন তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে সুদর্শন ভদ্রলোক। মাথায় ঘন চুল। পাকার অংশই বেশি। বয়স কত হবে ! পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নের মধ্যে।

রঞ্জন বলল, 'আপনি উঠলেন কেন ? বসুন। আপনাকে বোধ-হয় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও কিছু না। বসে বসে আপনার বাজনা শুনছিলাম। আপনি 'দেশ' বাজাচ্ছিলেন। আপনার প্রিয় রাগ-গুলির মধ্যে একটি আমারও প্রিয়।'

রঞ্জন তাঁর সামনের সোফাটিতে বসে পড়ে বলল, 'আপনি তাহলে অনেকক্ষণ এসেছেন। অনেকক্ষণ ওরা আপনাকে বসিয়ে রেখেছে। দেখুন তো কি কাণ্ড!'

ভদ্রলোক স্মিতমুখে বললেন, 'তাতে কিছু হয়নি। সময়টা কী ভাবে কেটে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি। আপনার 'দেশ' আমাকে দেশ-কাল ভুলিয়ে রেখেছিল।'

রঞ্জন খুশি হল। যে বাজনা তাকে নিজেকে তৃপ্তি দিতে পারেনি তাতে অন্য একজন আনন্দে মগ্ন হয়েছিলেন এই সংবাদ তাকে যেন নতুন করে আত্মপ্রত্যয় এনে দিল।

রঞ্জন সবিনয়ে বলল, 'আমার দেওয়ার শক্তির চেয়ে আপনার গ্রহণের শক্তি যে কতগুণ বেশি এটা তারই প্রমাণ। এমন অনেক গুণী সমঝদার আছেন যাঁরা সামান্য কিছুকে অসামান্য করে তোলেন। সেটা তাঁদের নিজেদের গুণ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'না মশাই, না। আমি আপনাকে অনেক দিন ধরেই চিনি। মানে, নামে চিনি। ঠিক নামেও নয়, আপনার সেতারেই আপনাকে চিনি। রেডিওতে আপনার প্রোগ্রাম থাকলে আমি বড় একটা মিস করি না। কোন অনুষ্ঠানে আপনি বাজাবেন শুনলে খুব বড় রকমের কোন বাধা-বিঘ্ন না এলে আমি গিয়ে হাজির হই কিন্তু ইদানীং বাইরে বড় একটা আপনাকে দেখতে পাইনা।'

রঞ্জন স্বীকার করে বলল, না, বাইরে আজকাল আর তেমন একটা বাজানো হয় না। নানারকমের ব্যাপার—'

একটু হেসে থেমে গেল রঞ্জন। একটু বিষণ্ণতার সুর যেন গোপন রইল না।

ভদ্রলোক বললেন, 'জানি। সব ক্ষেত্রেই এই রকম দলাদলি।'

একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-সব বিষয় নিয়ে আলোচনার মোটেই ইচ্ছা নেই রঞ্জনের। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে বলল 'আপনার পরিচয়টা—

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমার কোন পরিচয় নেই, আমি আপনার একজন মুগ্ধ শ্রোতা, অগণিত ভক্তদের একজন মাত্র।

রঞ্জন বিব্রত বোধ করে বলল, 'অমন করে বলবেন না। আপনার নাম—'

ভদ্রলোক বললেন 'নাম একটা আছে বটে। কিন্তু সেটা নিতান্তই আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ডাকবার সুবিধের জন্যে। সে নামের আর কোন সার্থকতা নেই। সে নামে আর কোন পরিচয় ব্যক্ত হয় না।'

অন্য সময় হলে এই কথাগুলিকে বিনয়ের আতিশয্য বলে মনে হতে পারত রঞ্জনের। কিন্তু তা হল না। বরং তার মনে হল এই অপরিচিত ভদ্রলোক যেন তারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি করলেন। এই অচেনা মানুষটি যেন আর কেউ নন, যেন রঞ্জনের নিজেরই আত্ম-প্রক্ষেপণ।

একটু বাদে রঞ্জন সান্ত্বনার ভাষায় সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'অমন করে বলবেন না। প্রত্যেকের নামই সার্থক। সেই নামে তার ব্যক্তি-পরিচয়। আমাদের প্রতিটি জীবনই অর্থপূর্ণ। সেই অর্থ অনেক সময় হারিয়ে যায়। নিজেকে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু সেই অর্থগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই বোধহয় আমাদের সারা জীবনের সাধনা।' তারপর একটু হেসে কৌতুকের ভঙ্গীতে বলল, 'কিন্তু আপনার নামটি জানতে পারলাম না। আগে শব্দ তার পরে তো তার অর্থ-বিচার।'

ভদ্রলোক এবার একটু কুণ্ঠায় সঙ্গে বললেন, 'আমি লজ্জিত।

আমার নাম পরিচয়টা আগেই আপনাকে জানানো উচিত ছিল। আমার নাম ভবেশ রায়চৌধুরী। থাকি কাছেই। নিত্যগোপাল চ্যাটার্জী লেনে। অল্পদিন হল এসেছি এ পাড়ায়। চাকরি একটা বিদেশী ফার্মে, হিসাব-রক্ষকের। কথা ছিল ননী সমাদ্দার নামে আমার একজন বন্ধু আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তিনি আপনার চেনা। কিন্তু তাঁর সময় হল না। আমি একাই চলে এলাম। আমি অবশ্য আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলবার সুযোগই চাইছিলাম। সেই সুযোগ হয়ে গেল।'

ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে রঞ্জন ডাকল, 'কার্তিক. দু কাপ চা দিয়ে যাও তো।'

ভবেশবাবু মৃদু আপত্তির সুরে বললেন, 'এত বেলায় আবার চা কেন ?'

রঞ্জন বলল, 'চা-টা গল্প করার সুবিধের জন্য।'

ভবেশবাবু বললেন, 'গল্প করতে আমিও ভালবাসি। কিন্তু আপনার সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। আপনি বাজাচ্ছিলেন, হয়তো এখনই আবার গিয়ে বাজাতে বসবেন। এরই মধ্যে আপনার যথেষ্ট সময় নিয়ে ফেলেছি। এবার দরকারের কথাটা বলি।'

রঞ্জন স্মিতমুখে বলল, 'বলুন।'

ভবেশবাবু বললেন, 'বড্ড সংকোচ হচ্ছে। আপনি হয়তো ভাববেন লোকটির মাথা খারাপ হয়েছে।'

'তা কেন ভাবতে যাব ? বলুন না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'আপনার কাছে সেতার শিখব এই আমার আকাঙ্ক্ষা।'

রঞ্জন একটু সময় চুপ করে রইল।

ভবেশবাবু বললেন, 'আমি ঠিকই অনুমান করেছি। এই বয়সে, যখন মাথার চুল সব পেকে গেছে—'

রঞ্জন বলল, 'চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চার কোন সম্বন্ধ নেই। বিদ্যা আর অর্থ অর্জনের বেলায় মানুষ অজর অমর। কথাটা তা নয়। আমারই সময় বড় কম।'

ভবেশবাবু বললেন, 'আমি জানি সে কথা। আমার সেই বন্ধুটি বলছিল আপনি ছাত্রছাত্রী নেওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। তবু আমাকে একটু সময় দিতে হবে। সপ্তাহে একটি দিন তো মাত্র। আমার অফিসের সময়টা বাদ দিয়ে আপনি যেদিন যখন বলবেন—'

রঞ্জন হিসেব করে দেখল সপ্তাহের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যা আর কোন সময় তার ফাঁক নেই, শুধু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটু সময় আছে। কিন্তু এই সময়টুকু রেখেছে সে নিতান্তই নিজের জন্যে। সে নিজের হাতে রুটিন তৈরি করে। নিজের জন্যে রুটিন, ছাত্রছাত্রীদের জন্যে রুটিন। আবার নিজেই নিজেই রুটিন ভাঙবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। নিজের মধ্যে একই সঙ্গে কেন যে এই সৃষ্টি আর ধ্বংসের খেলা তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। যে পথে চলতে চায় কে যেন সেই পথ থেকে অন্য পথে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পদে পদে পথভ্রষ্ট। তার স্বভাবের এই বৈপরীত্য বাইরের লোকে বেশি টের পায় না! কিন্তু অন্তরের রঙ্গমঞ্চে সুরাসুরের রক্তাক্ত সংগ্রাম চলতে থাকে।

কিন্তু নিজের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে ছাত্রছাত্রীদের কোন ক্ষতি হতে দেয় না রঞ্জন। প্রাণপণে সেখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা সে বজায় রেখে চলে। তাই শিক্ষক হিসাবে তার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। ক্ষতি হয় তার শিল্পীসত্তার। ক্ষতি হয় জীবনের ভারসাম্যের।

চা এল। ছোট্ট সেন্টার টেবিলটার ওপরে দু' কাপ চা রেখে গেল নিমাই। সম্প্রতি গাঁ থেকে এসেছে। লুঙ্গিখানা উঁচু করে গুটিয়ে পরেছে। খোলা গা। বউদির নিউ রিক্রুট। ওকে একটু শহরের আদব-কায়দা শেখাতে হবে।

চায়ের কাপটা ভবেশবাবুর দিকে এগিয়ে দিল রঞ্জন। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখি।'

ভবেশবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'না রঞ্জনবাবু, ভাববার সময় আপনাকে দেব না। দিলেই আপনি নেতিবাচক জবাব দেবেন। জীবনে অনেক না না শুনেছি রঞ্জনবাবু। আপনার কাছ থেকে তার পুনরাবৃত্তি শুনতে চাই না।'

রঞ্জন হঠাৎ বলে ফেলল, 'ঠিক আছে। আপনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আসুন। সেতার আছে আপনার?'

ভবেশবাবু বললেন, 'আছে। অভ্যাসটা বহু দিনের। প্রায় ছেলেবেলা থেকে বলা যায়। কিন্তু যাকে বলে এঁটে বেঁধে লেগে থাকা তা কোনদিনই জীবনে হল না। জীবনভর কেবল ধরেছি আর ছেড়েছি। শুধু সেতারের বেলায় নয়, এমন অনেক উদ্যমই আমার ক্ষণস্থায়ী। এখন উঠি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

উঠে দাঁড়ালেন ভবেশবাবু। দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ, গৌরবর্ণ। রঞ্জনের মনে হল শুধু সুদর্শন নয়, সৌম্যদর্শনও। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজের জীবনের অনেক কথাই উন্মোচিত করে ছিলেন অথচ শ্রোতাকে ভারাক্রান্ত করেছেন বলে মনে হল না। জীবনে ব্যর্থতাবোধ আছে কিন্তু তার জ্বালাটা প্রকট নয়।

বেরিয়ে যেতে যেতে ভবেশবাবু ফিরে দাঁড়ালেন, 'একটা কথা। বলতে বড় সংকোচ হচ্ছে—'

রঞ্জন স্মিতমুখে বলল, 'বলুন না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'দক্ষিণার কথাটা জেনে নেওয়া হল না।'

রঞ্জন বলল, 'এর জন্যে আটকাবে না। আপনি আগে আসুন—'

ভবেশবাবু হেসে বললেন, 'তার মানে আপনার ছাত্র হবার যোগ্যতা আছে কিনা তাই আগে পরখ করে দেখতে চান? অ্যাডমিশন টেস্টে পাস করলে তবে ও সব কথা উঠবে?'

রঞ্জন স্মিতমুখে বললল, 'না না, তা কিছু নয়। ধরে নিন ভর্তি আপনি এখনই হয়ে গেছেন। কথা যখন দিয়েছি আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'নিশ্চিন্ত হলাম। আমার বন্ধু ননীও আমাকে বলেছিল তুমি যাও রঞ্জনবাবুর কাছে। সম্ভব হলে উনি নিজেই তোমাকে শেখাবেন, না হলে এই লাইনে ওঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে তাঁদের কাউকে বলে দেবেন। ননী বলেছিল, উনি যদি তোমাকে ফিরিয়েও দেন, তোমার মনে হবে না তুমি শুধু হাতে ফিরে এসেছ। এখন দেখতে পাচ্ছি আমার সেই বন্ধুর কথা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য।'

স্মিতমুখে চুপ করে রইল রঞ্জন। ঘর থেকে রাস্তায় নেমে নব-পরিচিত ভদ্রলোককে সে আরও কয়েক পা এগিয়ে দিতে লাগল। এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

এ যেন বিদায় দিয়েও না দেওয়া! যেন বলে দেওয়া আমি ছেড়ে যাচ্ছি না। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, আমিও আছি তোমার সঙ্গে।

রঞ্জনকেও এইভাবে তার প্রিয়জনেরা এগিয়ে দিক তা সে পছন্দ করে, প্রত্যাশা করে। কিসের এই প্রত্যাশা? রঞ্জন যা পেয়েছে তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু কি পেতে চায়? সে কি চায় সংযুক্তি সম্মিলন অবিচ্ছিন্নতা? কেন এই সঙ্গের ক্ষুধা? কেন এই আসঙ্গ স্পৃহা?

ভবেশবাবু ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আর এগোবেন না। আপনি বাজাতে বাজাতে উঠে এসেছেন। এখনো আপনার আঙুলে মেরজাপ পরা।'

রঞ্জন নিজের মেরজাপটার দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

ভবেশবাবু মুগ্ধদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু। আর্টিস্টের হাতে মেরজাপ। হীরের আংটির চেয়েও সুন্দর !'

রঞ্জন একটু হেসে বলল, 'আপনি দেখছি একজন প্রচ্ছন্ন কবি।'

ভবেশবাবু বললেন, 'আমার সব কিছুই প্রচ্ছন্ন। আর আপনাদের সব কিছুই স্বতঃপ্রকাশ।'

রঞ্জন প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'আপনি কি এখন অফিসে যাবেন ?'

ভবেশবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'অফিস অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আপনার এখানে আসব বলেই আজ ছুটি নিয়েছিলাম। ছুটি নেওয়াটা সার্থক হল। দেখা হল। দেখা তো নয়, সন্দর্শন।'

রঞ্জন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ! তার এই ভাবী শিষ্যের কাছে সৌজন্যে, শিষ্টাচারে, বিনয়নম্রতায়, বাক-নৈপুণ্যেও পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

এরপর বাড়িতে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল রঞ্জন, বউদি পিছন থেকে বললেন, 'রাঙা ঠাকুরপোর কি মধ্যাহ্ন ভ্রমণ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল ?'

বউদি এমনিতে তাকে নাম ধরে ডাকেন। বয়সে পাঁচ বছরের বড়। কখনো কখনো ঠাট্টা করে তাঁকে রাঙা ঠাকুরপো বলেন, কখনো বা রাঙাবাবু কখনো বা রাঙাকর্তা। তাঁর সব সম্বোধনেই রঙ-ধ্বনিটুকু মিশে থাকে। বউদির নিজের রঙ শ্যামলা। রঞ্জনের রঙের মধ্যে একটু লালচে আভা আছে, তার জন্যে বউদি নিয়ত অসূয়াবতী। চারিটি ছেলেমেয়ের মা হয়েছেন, তবু তাঁর এই বর্ণবিদ্বেষ গেল না। এ বিদ্বেষে অবশ্য জ্বালা নেই, শুধু কৌতুক আছে। এ বিদ্বেষ তাই উপভোগ করে রঞ্জন।

বউদির কথার জবাবে রঞ্জন বলল, 'বেড়াতে তো যাইনি, ভদ্র-লোককে একটু এগিয়ে দিয়ে এলাম।'

'কে উনি ?'

'আর বল কেন ? সেতার শিখতে চান !'

'বাব্বা ! এই বয়সে ! শখ আছে তো খুব।'

রঞ্জন বলল, 'শখের কি আর বয়েস-টয়েস আছে বউদি ?'

'তুমি রাজী হয়ে গেলে তো ?'

'এমন করে ধরলেন—রঞ্জনের গলায় কৈফিয়তের সুর ফুটে উঠল।'

বউদি বললেন, 'ধরে তো সবাই। তাই বলে কি সবাই-এর কথায় রাজী হতে হবে নাকি ? এই না তুমি সেদিন বলেছিলে আর একটিও ছাত্রছাত্রী নেবে না, তাতে তোমার নিজের চর্চার ক্ষতি হয় ? এই বুঝি তোমাব প্রতিজ্ঞা ? দাঁড়াও, কাল থেকে আমিও এসে বসব তোমার সেতারের ক্লাসে।'

রঞ্জন বলল, 'বেশ তো বোস না। তোমার জন্য সিংহাসন পাতাই আছে।'

বউদি বললেন, 'ওরে বাবা! যে সে আসন নয় একেবারে সিংহাসন। এমন আসনের লোভ কতজনকে দেখিয়েছ রঞ্জনকুমার ? তাদের সংখ্যা কি শত . না সহস্র ?'

এ কথার জবাব না দিয়ে রঞ্জন নিজের ঘরে ঢুকল। মেয়েদের প্রসঙ্গ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। কোন-কোন হিংসুটে বন্ধুর ধারণা, সে সত্যিই একজন লেডী-কীলার, বহুবল্লভ। কারণ, তার যৌবন অতিক্রান্ত হলেও রূপ আছে। সেই রূপের আকর্ষণ সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। কিন্তু রঞ্জন নিজে জানে মেয়েদের কাছ থেকে সে বহু দূরে একগাদা মেয়ে এ বেলা ও বেলা তার কাছে শিক্ষা নিতে আসে। তাদের মধ্যে চেয়ে দেখবার মত রূপ কারো কারো নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু তাদের কারো দিকে অন্য কোন দৃষ্টিতে তাকাবার জো নেই। তাকাবার কথা মনেই থাকে না। সবই অভ্যাস। রঞ্জনের কোন কোন বন্ধু—মেয়েদের সম্বন্ধে যাদের লুব্ধতার

সীমা নেই, তাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, তুই কী করে পারিস বল তো? দিন-রাত রূপ রস নিয়ে কারবার, কিন্তু কোনদিন তোকে টলতে দেখলাম না।'

অন্য বন্ধু জবাব দেয়, 'ও কি আর দেখিয়ে দেখিয়ে টলে?'

এ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। রঞ্জন জানে যে-কোন মুহূর্তে তারও স্খলন হতে পারে। যদি একে স্খলন বলা যায়। অনেকের কাছেই ব্যাপারটা ডাল-ভাতের মত। চা-পান-সিগারেটের মত অতি নরম নেশা। ওতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু রঞ্জন জানে ব্যাপারটা অত তুচ্ছ করবার মত নয়। যে-কোন নেশাকে প্রশ্রয় দিলে সে বাচ্চা কুকুরের মত ঘাড়ে ওঠে, মাথায় ওঠে। হিংস্র জন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে সে প্রতিপালকের মেদ মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞানী-গুণীর স্বীকার-উক্তি রঞ্জন শুনেছে, পড়েছে। কারো কারো অন্তর্জ্বালা প্রত্যক্ষও করেছে। এদিক থেকে সে বরং খানিকটা রক্ষণশীল। একথা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুরা জানে।

রক্ষণশীল রঞ্জনের ওস্তাদও। যেমন তাঁর সুরের তত্ত্বে তেমনি তাঁর জীবনতত্ত্বে তিনি গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী। তিনি একাধিকবার বলেছেন, 'সুরা আউর ঔরৎ সে দূর রহ।' অনেক গুণী শিল্পী এই মৃত্যুমোহে পড়ে অকালে নষ্ট হয়েছে, সেইসব কাহিনী তিনি তাঁর ছাত্রদের শুনিয়েছেন। শেষে বলেছেন, এর ব্যতিক্রমও আছে। কেউ কেউ এসব দিব্যি হজম করতে পারে। তাদের কিছুতেই কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাই বলে তাদের নকল করতে যেও না! একজনের পক্ষে যা অমৃত, আর একজনের পক্ষে বিষ।'

ওস্তাদের কথা মনে হতেই রঞ্জন দু'হাত কপালে তুলে তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার করল। মনে মনে বলল, আমি রক্ষণশীল। আলবত রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতাই আমার রক্ষাকবচ।'

ওস্তাদের কথা আবার মনে হল রঞ্জনের। তাঁর ওস্তাদ কিন্তু তার

মত অবিবাহিত নন। তিনি গৃহী, সংসারী, ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি মেয়েকে। সেই প্রেমের জন্যে দুজনেই প্রথম জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কৃচ্ছ্রতা বরণ করেছেন। সেই প্রেম আজও তাঁদের অটুট। কত অসুখী দাম্পত্য-জীবন দেখেছে রঞ্জন, কত পারস্পরিক বিশ্বাস-হনন প্রত্যক্ষ করেছে, কত আত্মীয়-বন্ধুর জীবনে বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতার সাক্ষী হয়েছে কিন্তু এই একটি সুখী দম্পতিও রঞ্জনের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। শিল্পীরাও একটি নারীকে নিয়ে সুস্থ সুন্দর পরিতৃপ্ত জীবনযাপন করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত রঞ্জনের ওস্তাদ।

আশ্চর্য, ওস্তাদ বিয়ে করে সুখী হয়েছেন, কিন্তু রঞ্জনকে কখনও বিয়ে করবার জন্যে খুব একটা পীড়াপীড়ি করেননি! বরং সুর নিয়ে থাক, সঙ্গীত নিয়ে থাক এই যেন তাঁর উচ্চারিত কি অনুচ্চারিত নির্দেশ ছিল। তোমার ঘরে তোমার যন্ত্র ছাড়া আর কাউকে দরকার নেই। না কোন ব্যক্তির, না কোন বস্তুর। ওস্তাদের যেন একটা অভিলাষ রঞ্জনের মধ্যে ব্যক্ত হয়ে রয়েছে। অগৃহী হবার, নিরাসক্ত নিঃসম্পর্কিত হবার, শুধু সঙ্গীত-সর্বস্ব হবার বাসনা। শুধু সঙ্গীত? সঙ্গীত কি জীবনকে সব দিতে পারে? ওস্তাদ বলেন পারে। বাহ্যিক ভোগ-সুখের মধ্যে থেকেও তিনি বলেন, পারে। তিনি হয়তো অসংশয়ী। কিন্তু রঞ্জন অমন সংশয়হীন নয়। তার চিত্ত দ্বিধা-দুর্বল। কখনো তার মনে হয় সঙ্গীতই সব। জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন নেই। আবার কখনো মন অন্য কথা বলে। জীবনের আরো অনেক দাবি আছে। সেই সব দাবি না মেটালে তা অপূর্ণ অসম্পূর্ণ থাকে। জীবন একতারা নয়, সপ্ততন্ত্রী। মন বলে 'সঙ্গীত আমার প্রথম প্রেম, প্রধান প্রেম, হয়তো সর্বশেষ প্রেম—কিন্তু একমাত্র প্রেম নয়।' কাউকেই ধরে রাখবার জো নেই। কাউকেই মনে করে রাখবার জো নেই। কারো সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠলে তো মনে থাকবে।

রঞ্জন ধরা-ছোঁয়া দেবে না অথচ আশা করবে স্থায়ী গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক, তাই কি হয়? সোনার পাথরবাটি কি সম্ভব?

ভাইঝি এসে তাড়া দিল, 'কাকু বেলা যে একটা বেজে গেল। কখন স্নান করবে?'

নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন। এলোমেলো ভাবনা-স্রোতে কুটোর মধ্যে ভেসে যেতে যেতে সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল।

ভবেশবাবু মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার সময় ঠিক এসে হাজির হলেন। হাতে নীল ঢাকনায় ঢাকা তাঁর সেতার। নিজে শ্বেতাম্বর। পরনে তেমনি মিহি ধুতি-পাঞ্জাবি। শান্ত, সৌম্যদর্শন, স্মিতমুখ।

বাইরের ঘর থেকে রঞ্জন তাঁকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে এনে বসাল। ঘরখানি বেশ বড়। মেঝের ওপর কার্পেট পাতা। তার ওপর চাঁপাফুলের রঙের চাদর। একদিকে ছোট-বড় দুটি সেতার। তানপুরা। কোণের দিকে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা। দেয়ালে বড় একখানি বীণাবাদিনী সরস্বতীর ছবি। সুবৃহৎ একটি শ্বেত শতদলের উপর উপবিষ্টা।

ভবেশবাবু সেতারটি রেখে করজোড়ে শতদলবাসিনীকে নমস্কার জানালেন। তারপর ঈষৎ নম্র হয়ে নমস্কার জানালেন রঞ্জনকেও।

রঞ্জন একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, আ হা হা ওকি! বসুন।'

তারপর আনম্রভাবে সে-ও প্রতি-নমস্কার জানাল।

ভবেশবাবু আসন গ্রহণ করে বললেন, আপনার ঘরখানি বড় সুন্দর। মনে হয় একটি পবিত্র মন্দিরে এসে পড়েছি। সুর-মন্দির।'

রঞ্জন স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

ভবেশবাবু বললেন, 'এখানেই আপনি ক্লাস নেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নিজেও এখানে বসে বাজান !'

'হ্যাঁ।'

'রাত্রে কি এই ঘরে থাকেন ?

রঞ্জন একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এক-ঘবে।'

নিমাই আজও দু-কাপ চা নিয়ে এল।

ভবেশবাবু বললেন, 'আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। অফিস থেকে বেরিয়ে বাস-ট্রাম পাওয়া খুব শক্ত। তারপর বাড়িতে গিয়ে ধড়া-চুড়ো ছেড়ে—'

রঞ্জন বলল, 'অফিসে বোধহয় সাহেব সেজে বোরোতে হয়।'

ভবেশবাবু বললেন, আর বলেন কেন ? একেবারে টিপটপ। আমাদেরই না হয় ব্রিটিশ ফার্ম। কিন্তু বাঙালী অফিসেও তো সব সাহেব। ধুতি-পাঞ্জাবি আমাদের জেনারেশনেই শেষ।'

বঞ্জন বলল, আপনি ইচ্ছা করলে ট্রাউজার্স পরেও আসতে পারেন। আমার কোন কোন অফিসার ছাত্র আসেন। তাঁদের এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে ধুতি পরতেই পারেন না। আম মাঝে তাঁদের উঁচু টুল কি জলচৌকি পেতে দিই। কেউ কেউ আবার মেঝেতে বসে পড়েন।'

একটু থেমে রঞ্জন হাসল, আ:ম মাঝে মাঝে দু-একজন বিদেশী ছাত্রও পাই। জার্মানী থেকে আসে, আমেরিকা থেকে আসে। তাদেব আবার ধুতি-পাঞ্জাবির শখ। সবাই নতুনত্ব চায়, বৈচিত্র্য চায়।

ভবেশবাবু বললেন, তা ঠিক। 'রো কাছে পরবেশ বড় মনোহর কারো কাছে পরবশ্যতা।'

রঞ্জন বলল, 'এবার আপনার বাজনা একটু শুনব। সেতারের ঢাকনিটা খুলুন।'

ভবেশবাবু আবার কিছুক্ষণ বিনয় প্রকাশ করলেন। বাজানো-

টাঙ্গানো অনেক দিনকার অভ্যাস নেই তাঁর। হাত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

নমুনা হিসাবে একটুখানি বেহাগ বাজালেন ভবেশবাবু। তারপর নিজেই হঠাৎ থেমে গিয়ে লজ্জিতভাবে হাসলেন। সেই হাসি যেন প্রৌঢ়ের নয়, সেই হাসিতে একটি কিশোরের মধ্র সলজ্জ ভঙ্গী ফুটে উঠল।

তিনি বললেন, কিছুই হচ্ছে না বোধহয়।

সুরের মধ্যে যে অসঙ্গতি অনুভব করছিল রঞ্জন, ভদ্রলোকের সনম্র লজ্জিত হাসিতে তা যেন ঢাকা পড়ে গেল। রূপ! রূপ রঞ্জনকে মুগ্ধ করে। কে জানে গুণের চেয়ে তার মধ্যে রূপের আকর্ষণই বোধহয় বেশি। আকর্ষণ সে অনুভব করে। কিন্তু সেই সঙ্গে কিসের যেন একট অনৌচিত্য বোধ তাকে পীড়া দেয়। রূপ দেখে মুগ্ধ তো জগৎশুদ্ধ মানুষ। এতে রঞ্জনের বৈশিষ্ট্য কোথায়? সে যদি গুণী হতে চায়, গুণের সমাদর তার কাছে অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু যে রূপের সে ভক্ত, নারীর রূপ তার প্রতীক মাত্র। রূপের পরিব্যাপ্তি বিশ্বময়তা সে মাঝে মাঝে অনুভব করে। যিনি রূপস্রষ্টা তিনি যেন মুঠোয় মুঠোয় পত্র-পল্লবে নদী-পর্বতে, জীব-জন্তুতে নর-নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রূপ ছিটিয়ে দেননি, বিশ্বের সর্বত্র পুঞ্জ পুঞ্জ রূপ ছড়িয়ে রেখেছেন। রূপের বাইরে জগৎ নেই, রূপের বাইরে জগদীশ্বরও নেই। তাই কি সেই পরম রূপস্রষ্টার নাম বিশ্বরূপ? আশ্চর্য রঞ্জন কি তার বাল্যের কৈশোরের আস্তিকতায় ফিরে আসছে? ঠিক তা নয়। সে যখন শিল্পী, সে যখন রূপ চিন্তায় আবদ্ধ তখন তার চিন্তার ভাষা আস্তিকের ভাষা। এই বৈদ্যুতিক যুগেও তো কবিরা প্রদীপকে ছাড়তে পারেননি। এখনো একটি মৃৎ-প্রদীপ তার রোমান্টিক সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে যা একশো পাওয়ারের বাল্ব পারে না। রঞ্জন যখন যুক্তিবাদী, যে দর্শন বিজ্ঞানে তার কিছুমাত্র অধিকার নেই সেই

অশিক্ষিত পটুত্বের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সে নিরীশ্বরবাদী। এই স্ব-বিরোধ, এই দ্বৈত সত্তা রঞ্জনের ওস্তাদের মধ্যে হয়তো নেই। কিন্তু রঞ্জনের মধ্যে আছে। পদে পদে সে দ্বিধা-বিভক্ত। পদে পদে বাদী আর বিবাদী স্বর তীব্র ঝঙ্কারে তার মনোযন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

রঞ্জনের জগৎ ধ্বনির জগৎ, শ্রুতির জগৎ। কিন্তু দৃশ্যময় যে রূপের জগৎ তা-ও তাকে সমান আকর্ষণ করে। ছেলেবেলায় তার ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল। আত্মীয়-স্বজনরা ভেবেছিলেন সে যদি শিল্পী হয়, তুলিই সে হাতে তুলে নেবে। রেখা আর আর রঙ-ই হবে তার ভাব-প্রকাশের ভাষা। কিন্তু জীবনের মোড় ঘুরে গেল বিচিত্র ভাবে। কিন্তু রূপের জগৎ তাকে ছেড়ে যায় নি। রূপতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হয়ে তা তার দুই চোখে আশ্রয় নিয়েছে। ধ্বনির জগৎ তার কাছে মুহূর্তে রূপের জগৎ হয়ে ওঠে। রাগ-রাগিনীর যে শাস্ত্রীয় রূপ-কল্পনা আছে, রঞ্জনের ভাবনায় তা যেন মাঝে মাঝে অন্য রূপ নিতে চায়। সে রূপ তার স্বকীয় সৃষ্টি।

ভবেশবাবু হেসে বললেন, 'আমার বোধহয় তাহলে কিছুই হওয়ার আশা নেই। আপনি কোন কথাই বললেন না।'

রঞ্জন এবার লজ্জিত হল। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একজন বাইরের ভদ্রলোককে সামনে বসিয়ে রেখে সে আত্ম-চিন্তার দুর্গম গহনে প্রবেশ করেছিল। অমার্জনীয় অশিষ্টতা।

অপরাধ-স্খলনের জন্য রঞ্জন এবার সচেষ্ট হয়ে উঠল, 'না না' কি যে বলেন! আশা থাকবে না কেন? আপনার প্র্যাকটিশ নেই বলছিলেন। সেই তুলনায় আপনি যথেষ্ট ভালো বাজিয়েছেন।'

এর আগে কার কাছে ভবেশবাবু শিক্ষা করেছেন খোঁজ নিল রঞ্জন। রেয়াজ করার জন্যে যথারীতি উপদেশ-নির্দেশ দিল। ভদ্রলোক সুবোধ বালকের মত সব শুনে গেলেন।

একটু বাদে হেসে বললেন, তাহলে আপনি বলছেন হবে? কথাটা

মেয়েকে গিয়ে বলতে হবে। আমার মেয়ে কি বলেন জানেন? বলে বাবা তোমার সুরজ্ঞানের 'সু'টুকুও নেই। তোমার কিছু হবে না। মেয়ের চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি, দেখব হয় কি না হয় সে আমাকে উল্টোদিক থেকে ইনস্পায়ার করেছে। আমার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমার বাজি। আমার মেয়ে কিন্তু ভালো গাইতে পারে, চমৎকার গলা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। বাৎসল্য-স্নেহে প্রৌঢ়ের মুখখানি কোমল কমনীয় হয়ে উঠল।

ভবেশবাবু বললেন, 'একদিন নিয়ে যাব আপনাকে। ওর গান শুনবেন। অবশ্য এখনো শিখছে। তাও কি তেমন মন দিয়ে শেখে?'

রঞ্জন সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় শেখে?'

এই কাছাকাছি কি একটা স্কুলে। নিজেই সব ঠিকঠাক করেছে! আজকালকার ছেলেমেয়ে তো। সব স্বাধীনচেতা। তাতে আবার পলিটিকাল সায়েন্স নিয়ে এম এ. পড়ছে। রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে তো ওর সঙ্গে কথা বলারই জো নেই। বলে, বাবা তুমি চুপ কর। ওসব তোমার সাবজেক্টই নয়। সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়েই কি আমাকে কোন কথা বলতে দেয়? সে সব দপ্তরও ওদের দখলে।'

ভবেশবাবু স্মিতমুখে তাকিয়ে থাকেন রঞ্জনের দিকে। মাথায় পরাজয়ের শ্বেত-পতাকা। একটু আগেই চুলগুলি পেকে গেছে। কিন্তু সেজন্যে কোন ক্ষোভ নেই। অভিযোগ-অনুযোগ নেই। কত সহজে বয়সকে তিনি মেনে নিয়েছেন। রঞ্জন কি পারে, রঞ্জন কি পারে এমন অবলীলায় বার্ধক্যকে গ্রহণ করতে? এই ভদ্রলোক নব প্রজন্মকে দেখছেন নিজের ছেলেমেয়েদের ভিতর দিয়ে। সে যেন তাঁরই নবজন্ম। রঞ্জনও নবযুগকে দেখতে পায় নিজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। কি তরুণ সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে। কিন্তু অমন করে সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে কি? কত মতান্তর মনান্তর অস্বীকৃতির

জন্যে ক্ষোভ, প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়, মেনে নিতে হয়। নতুন কালের কাছে পরাভব অনিবার্য যদি না তাকে অস্বীকার করা যায়, যদি না অভিন্নতাবোধ জন্মে।

ভবেশবাবু হাসিমুখে বলতে লাগলেন, সব এক দিকে। আমার মেয়ে, আমার ছেলে, এমনকি ওদের মা-ও। সে-ও যেন ওদের সমবয়সী। সে-ও যেন ওই দলে। শুধু একা আমি প্রতিপক্ষ। একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়।'

রঞ্জন ভাবল, তাই বটে। বুঁদির গড় নকলই বটে। কিন্তু সে কথা কি সব সময় মনে রাখা যায়?

ভবেশবাবু বিদায় নেওয়ার উদ্যোগ করলেন। যাওয়ার আগে নিজের সঙ্গীত চর্চার প্রসঙ্গ আর একবার তুললেন, তাহলে আপনি বলছেন, আশা আছে? আবার ধরব?'

রঞ্জনও তাকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চলল।

ভবেশবাবুর কথার জবাবে বলল, ধরবেন বইকি। নিজের আনন্দের জন্য বাজাবেন!

তিনি বললেন, সে তো নিশ্চয়ই। নিজের আনন্দের জন্যেই তো। আমি কি এই বয়সে সেতার শিখে পাবলিক ডেমনস্ট্রেশন দিতে যাব? তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি শুধু নিজের আনন্দের জন্যেই বাজাতে চাই। তার জন্যে যতটুকু শিক্ষা দরকার, শিখতে চাই। নিজের আনন্দের জন্যে। আর যদি শোনাবার মত অন্তত একজনকেও পাই, তার জন্যে। সেই আমার শ্রোতা একাই একশো নয়, একাই একলক্ষ।'

রঞ্জন মৃদু হেসে বললো, তেমন একজন তো আপনার আছেন।'

ভবেশবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর কথা বলছেন? তিনি গান বাজনার ধার ধারেন না। তাঁর আছে সাহিত্য। অবসর পেলেই

বই নিয়ে বসেন। যে-কোন লেখকের যে-কোন বই হলেই হল। আমি বলি, তোমার কাছে কি সব ছাপার অক্ষরই সমান? একালের সাহিত্যের হালচাল আমি তাঁর কাছ থেকে শুনে নিই। এজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।'

ভবেশবাবু হাসলেন।

আর সেই হাসির মধ্যে একজন প্রসন্ন পরিতৃপ্ত পত্নী-প্রেমিককে প্রত্যক্ষ করল রঞ্জন। দাম্পত্য-জীবন। প্রবীণ নবীন বহু দম্পতির সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা আছে। অনুভবে, কল্পনায় দাম্পত্য-জীবনের কোন স্বাদ কোন রহস্যই তার কাছে অননুমেয় নয়। তবু সে এই জীবনের বাইরে। দাম্পত্য-জীবন কি পরিপূর্ণতার দ্যোতক? রঞ্জন নিশ্চয়ই তা মনে করে না। দাম্পত্য-জীবনও বিশাল বিপুল সমগ্র জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীবনের পরিপূর্ণতা তাহলে কোথায়? রঞ্জন সঙ্গীতের সঙ্গে সুরের সঙ্গে জীবনের মেল বেঁধেছে। অন্তত বাঁধবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই সুরের জীবনও কি আংশিক নয়? খণ্ডিত নয়? নাকি পূর্ণতা কোথাও নেই, তা শুধু ওই নামের মধ্যেই আছে, অপূর্ণতার বেদনার মধ্যেই আছে?

আকাশে তারার খেলা। পথে গাড়ির। ট্যাক্সি চলছে, রিক্সা চলছে, লরি চলছে, ট্রাক চলছে। পাড়ার এই পথটি এখন যানবহুল রাজপথ। বাসগুলি থেকে লোক সব উপচে উপচে পড়ছে। সাবধানে পথ চলছিলেন ভবেশ বাবু। রঞ্জন চলছিল তাঁর পিছনে-পিছনে। একটি খালি রিক্সা দেখে সেই ডেকে দিল। ভবেশবাবু খুশি হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, 'আপনিও আসুন না বেড়িয়ে আসবেন আমাদের বাড়ি থেকে। রাত তো এমন কিছু হয়নি।'

রঞ্জন একটু ইতস্তত করল। বলল, 'আজ থাক।'

॥ ২ ॥

মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেও রঞ্জন ক্লাস নিতে শুরু করেছে শুনে আরো দু-একজন এসে ধরল তারাও ওইদিন রাত্রে এসে শিখবে।

বউদি ঠাট্টা করে বললেন, নিয়ে নাও রঞ্জন। তোমার এখন কপাল খুলে গেছে। দু'হাতে টাকা রোজগার কর। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ফুলে ফেঁপে উঠুক।'

দাদা আড়াই হাজার টাকা মাইনের এঞ্জিনিয়ার। বউদি যখন রঞ্জনের অর্থাগম নিয়ে ঠাট্টা করেন যেন কেমন কেমন শোনায়। শুধু দাদা নয়, রঞ্জনের মেজদা সেজদা এমনকি ছোটভাইয়েরাও কেউ কেউ ভালো চাকুরে, কেউ বা ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু রঞ্জন তো সে পথে যায়নি। গান-বাজনার লাইনে থেকেও অনেকেই আজকাল অর্থবান হয়। কিন্তু সে অমন রাজপথ ধরতে পারেনি। বিশিষ্ট একটি ধারার মধ্যেই নিজেকে ধরে রেখেছে। তার নাম বিশুদ্ধ সঙ্গীত। অবশ্য এ সম্বন্ধেও তার মন তর্কাতীত নয়। জীবনে সাফল্যের মানে যাদের কাছে আলাদা, তারা অবশ্য অন্য কথা ভাবে। তাদের ধারণা, রঞ্জন জীবনে আর কিছু করতে পারল না বলেই গান-বাজনা করে। কেউ বা উল্টো দিক থেকে ভাবে, গান-বাজনা করল বলেই জীবনে ও কিছু করতে পারল না।

আজকাল তার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, একটুও ফাঁক নেই, অবসর নেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের, সামাজিকতার, যেটা তার জীবনের দ্বিতীয় বিলাস। দ্বিতীয়, নাকি প্রথম এবং একমাত্র? সঙ্গীতকে যদি সে স্বকর্ম বলে, সামাজিকতাকে বলতে পারে কর্ম-বিরতি। বিরাম-বিশ্রাম অবসর যাপন। বাড়ির লোকজনের কাছে অবশ্য এর একটি মাত্র নামই আছে—আড্ডা। ছোট ভাইরাও বলে, 'তুমি বড় আড্ডাবাজ হয়ে যাচ্ছ।'

অবশ্য গান-বাজনার সঙ্গে আড্ডার একটা সম্পর্ক আছে। ওস্তাদ-কেও দেখেছে অবসর সময় তিনি কত গল্প গুজব করেন। শুধু যে গাইয়ে-বাজিয়েদের সঙ্গেই আড্ডা দেন তা নয়। তাঁর চেনা গণ্ডি আরও বড়। তিনি সঙ্গীতের সাধক, সমঝদার, আবার সেই সঙ্গে জীবন-রসিক।

কিন্তু তাঁর আড্ডা দেওয়া আর রঞ্জনের আড্ডা দেওয়া ঠিক এক রকমের নয়। তিনি আড্ডা থেকে ফিরে এসে আড্ডার কথা একেবারে ভুলে যান। কিন্তু রঞ্জন মনে করে রাখে। রঞ্জন নিরাসক্ত থাকে না, নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। অসামান্য তার সঙ্গের ক্ষুধা। তার আসঙ্গ লিপ্সার যেন সীমা নেই। কারো সঙ্গে কোন রকমের একটু সম্পর্কের সূত্রপাত হলে রঞ্জন যেন সেই সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, বাড়িয়ে চলতে চায়। প্রতিদান চায় তার কাছ থেকে। না পেলে ক্ষুব্ধ হয়। ছিটে-ফোঁটা পেলেও আনন্দে মন ভরে ওঠে। নিজের পাগলামি দেখে নিজেই মাঝে মাঝে হাসে রঞ্জন। এ কী কাঙালপনা! তার জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবের অভাব নেই। বৃহৎ পরিবার তাদের। একটা বাড়িই যেন একটা পাড়া। হৃদয়-চর্চার জন্য পাত্র-পাত্রীর কি তার অভাব আছে? তবু মন চায় ক্ষেত্রের বিস্তার। আসমুদ্র পৃথিবীকে বাহুবন্ধনে না বাঁধতে পারলে তার যেন তৃপ্তি নেই।

একই সঙ্গে সঙ্গীত-সুধা আর সঙ্গ-সুধা তাকে আকৃষ্ট করে, যেন একটি নয়, দুটি সেতার সে বাজাতে চায়। একটি তার নিজের যন্ত্র, আর একটা তার হৃদয়যন্ত্র। কখনো কখনো মনে হয় দ্বিতীয়টিই প্রধান। প্রধানও একমাত্র। আবার যখন সেতার নিয়ে বসে রঞ্জন, সুরের মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়ে, সেই সুধাবৃষ্টির কাছে সব নগণ্য হয়ে যায়। তখন প্রতিটি ঝঙ্কারে অপার্থিব আনন্দ। সেই সুরসঙ্গমের সঙ্গে কোন মিলনসুখেরই কি তুলনা হয়?

মঙ্গলবারের জন্যে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে আর কাউকে

শিক্ষার্থী হিসাবে নিল না। একটি এসেছিল কিশোরী, আর একটি অল্পবয়সী ছেলে। ওদের ফিরিয়ে দিতে কষ্ট হল, মায়া হল রঞ্জনের। এই মায়ার জন্য সে আরো অনেককে ফেরাতে পারেনি। আজ ছাত্র-ছাত্রীতে ভরা তার ঘর। কিন্তু বাইরের অনেকেই জানে না এদের কেউ কেউ তাকে যৎসামান্য দক্ষিণা দেয়, কেউ কেউ বা তা-ও দেয় না। তবু ওদের মধ্যে যার একটু আগ্রহ দেখে, নিষ্ঠা দেখে, তাকে শেখায় রঞ্জন। যত্ন করেই শেখায়। মনে মনে ভাবে, আমার যা হবার তা তো হয়ে গেছে ! ওরা যদি একটু পায় পাক, ওদের যদি আর একটু হয় হোক না।

কিন্তু এই শেখানো নিয়েও সে আর এক রকমের অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। সে কি ক্রমে ক্রমে শুধু ট্রেনার হতে যাচ্ছে ? সেতার-শিক্ষক, এই কি হবে তার একমাত্র পরিচয় ? 'শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ !' সেই অভিশপ্ততার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি রঞ্জন ? অনুতাপে দগ্ধ রঞ্জন নিজের রেয়াজের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত মাঝে মাঝে রেয়াজ করে। কোন কোন দিন সারা রাত।

দোতলা থেকে বৃদ্ধা মা মাঝে মাঝে নেমে আসেন তার ঘরে। রুদ্ধদ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে নাম ধরে তাকে ডাকতে থাকেন। সাড়া না পেলে ঘা মারতে থাকেন দরজায়। মমতার সেই করাঘাত শিল্পীর হাতের যন্ত্রধ্বনির মত শোনায়।

সেতার রেখে উঠে পড়ে রঞ্জন। দোর খুলে দেয়।

মা সামনে দাঁড়িয়ে। হাঁপাচ্ছেন।

রঞ্জন বলে, 'তুমি কেন এলে মা ? তোমার না নীচে নামা বারণ।'

মা বলেন, 'না নেমে পারলাম কই। তুই কি ঘুমোবি না ? তুই কি মরবি ?'

সেতার হাতে যদি মরতে পারে রঞ্জন তার চেয়ে সুখের মরণ আর কি আছে ?

কিন্তু মা-র যে বড় কষ্ট হবে। মাকে ছেড়ে সে যে মরতেও পারে না, নড়তেও পাবে না।

অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাকে তাঁর ঘরে রঞ্জন পৌঁছে দিয়ে আসে। সেদিন আর বাজানো হয় না। মায়ের কথাগুলিই সুর হয়ে মনের মধ্যে বাজতে থাকে।

অবশ্য কোন কোন সময় এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তিও পায় রঞ্জন। ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে শেখাতে তার শিক্ষক-সত্তা আব শিল্পী-সত্তা একসঙ্গে মিশে হরিহরাত্মা হয়ে যায়। বিশেষ কবে কারো মধ্যে যখন নিষ্ঠা আগ্রহ আর নৈপুণ্য লক্ষ্য করে, রঞ্জনের আনন্দের সীমা থাকে না।

সপ্তাহ তিনেক ভবেশবাবু নিয়মিতই এলেন। কিন্তু চতুর্থ সপ্তাহেব শুরুতে সকালের দিকে একটি ছেলে এসে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা কবল। বলে দিতে হল না সে ভবেশবাবুরই ছেলে। মুখের সাদৃশ্য চেহারার সাদৃশ্য দেখে সহজেই চেনা যায়। সুদর্শন, বেশ লম্বা চেহারা। মাথায় বোধহয় এরই মধ্যে বাপকে ছাড়িয়েছে। আঠাবো-উনিশ বছরের তরুণ। গালে কোমল দাড়ি গজিয়েছে। এখনো বোধহয় চাঁছ পড়েনি। ঠোঁটের ওপর গোঁফটি কিন্তু ঈষৎ পুষ্ট। পরনে ডোরাকাটা পাজামা, গায়ে চকরা-বকরা শার্ট। রঞ্জন এদের বলে বিচিত্রাঙ্গদ। আগেকার যাত্রার দলের রাজপোষাকের মধ্যে এখনকার ছেলেরা রাজকীয় মহিমা আবিষ্কার করেছে। দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বলল, 'আমি ভবেশবাবুর কাছ থেকে এসেছি।'

রঞ্জন একটু হেসে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তুমি তাঁর ছেলে তো ? এস ভিতরে এস।'

ভবেশবাবু যে সোফাটায় বসেছিলেন আশ্চর্য সোফার ঠিক সেই

জায়গাটাতেই বসল ছেলেটি। রঞ্জন বসল তার সামনে। সেদিন যেমন ভবেশবাবুর সামনে বসেছিল। যেন ভবেশবাবুই তাঁর তরুণ বয়সের মূর্তি নিয়ে রঞ্জনের সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন। নাকি রঞ্জনই বহু বছর পূর্বের একটি দিনে ফিরে গেছে। বাপ-ছেলের আকৃতিগত সাদৃশ্য আরো দেখেছে রঞ্জন। নিজের বন্ধুদের ছেলেমেয়ের মুখে আদল দেখলে তার অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। প্রকৃতি নিজেকে কি ভাবে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে তাই দেখে। রঞ্জন নিজেও তো এক রাগিণী যে কতবার বাজায় তার ঠিক নেই। তবু প্রতিবার সেই সঙ্গীত-রূপ নতুন। কুমারটুলীর মৃৎ শিল্পী জীবন পালের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে। সে একই দুর্গাপ্রতিমা বছর বছর গড়ে। অল্প-স্বল্প অদল-বদল করে হয়তো। যারা দেখে তারা কোন অভিযোগ করে না। জিজ্ঞাসা করলে, জীবনও হয়তো বলবে যে, নতুন সৃষ্টির আনন্দই পাচ্ছে। প্রকৃতি অবশ্য পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি করে না। বাপছেলের মধ্যে যতই সাদৃশ্য থাকুক, তারা সম্পূর্ণ এক চেহারার হয় না। স্বভাবের দিক থেকেও যতই একজনকে আর একজনের প্রোটোটাইপ বলে মনে হোক না, কি কালের সেইরকম ইচ্ছা থাকুক না, ছেলে তা হয় না। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকৃতির আনন্দ। তবু আশ্চর্য বাপ-ছেলের আকৃতির সাদৃশ্য দেখতে ভালো লাগে রঞ্জনের। সে কি কনভেনশনাল? এ-ও কি তার সব এক ধরনের রক্ষণশীলতা? এই সাদৃশ্য-প্রীতি কি তার ঐতিহ্য-প্রিয়তার লক্ষণ? অথচ সে নতুন হতে চায়, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চায়। পুনরাবৃত্তি তাকে ক্লান্ত করে।

'বাবা আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন।'

ছেলেটি তার পকেট থেকে একখানা সাদা খাম বের করল।

খামের মুখ আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়নি। খোলাই আছে। ভবেশবাবুর প্যাডের কাগজের রঙও সাদা। পাঠের বেলায় তিনি শুরুতে মনঃস্থির করতে পারেন নি। প্রথমে লিখেছিলেন প্রীতি-

ভাজনেষু। তারপর শব্দটি কেটে দিয়ে লিখেছেন শ্রদ্ধাস্পদেষু। বয়সে ভবেশবাবু তার চেয়ে অনেক বড়। অন্তত দশ বারো বছরের বড় তো হবেনই। কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন গুরুশিষ্যের। চিঠিতে তাকে তিনি সেই গুরুর গৌরব দিয়েছেন।

ভবেশবাবু লিখেছেনঃ জয়ন্তকে পাঠালাম, ওর কাছে সব শুনবেন। কাল অফিস থেকে ফেরার পথে বাস থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙে বসে আছি। নড়া-চড়া বন্ধ। ডাক্তার দেখিয়েছি। তিনি যা করবার করেছেন। অধিকন্তু আর একজন লেডী ডাক্তার উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি লাগিয়েছেন চুন-হলুদ। পদসেবা করছেন, কিন্তু নীরবে নয়। তিনি মুহূর্মুহূ গাল দিচ্ছেন আর বলছেন তোমার যা চালচলন তাতে তোমার বাস-চাপা পড়াই উচিত ছিল। আমি মুখ চুন করে বসে আছি। গ্রহের ফের আর কাকে বলে। আজ তো আর গুরুপাঠে যেতে পারছি না, কতদিনে যে যেতে পারব তারও ঠিক নেই। আপনি যদি দয়া করে সন্ধ্যার দিকে একবার আসেন, আমি সপরিবারে কৃতার্থ হব। আপনার তো অনেকদিন ধরেই আসবার কথা চলছে। আজ চলে আসুন।

গোড়ায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলে কি হবে সারা চিঠিতে সরস প্রীতি-পূর্ণ সৌহার্দ্য জানিয়েছেন ভবেশবাবু। রঞ্জনও তো তাই চায়। বন্ধুত্ব চায়। শুধু শ্রদ্ধেয় হয়ে দূরে থাকতে চায় না। সমবয়সী অল্পবয়সী সকলের সৌখ্য তার কাম্য।

চিঠি পড়া শেষ করে রঞ্জন স্মিতমুখে জয়ন্তের দিকে তাকাল। 'ফ্র্যাকচার হয়েছে নাকি ?'

জয়ন্ত বলল, কী জানি। এক্সরে না করলে তো কিছু বোঝা যাবে না। মনে তো ·হয় স্প্রেন টেনই কিছু একটা হবে। বাবা একটু ভীরু টাইপের মানুষ। অল্পেই কাতর হয়ে পড়েন। কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা একদম নেই।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'তোমার আছে ?'

জয়ন্ত বলল, 'বাবার চেয়ে অনেক বেশি আছে। আপনি যাচ্ছেন তো ? সন্ধ্যায় আমি আপনাকে নিতে আসব। বাবা তাই বলে দিয়েছেন।'

রঞ্জন ভাবল, জয়ন্ত ধরেই নিয়েছে সে যাবে। না গিয়ে পারবে না।

'না না, তোমায় আসতে হবে না। আমিই যাব। ওই তো পার্কের ওপারে তিনতলা ফ্ল্যাট-বাড়িটা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর দোতলায়। চিনে যেতে পারবেন তো ?'

রঞ্জন হেসে বলল, 'এই পাড়ায় জন্মাবধি আছি।'

জয়ন্ত বলল, 'তাহলে আসবেন কিন্তু। সবাই আমরা আপনার জন্যে ওয়েট করব। জানেন, রোজই আপনার কথা হয় আমাদের বাড়িতে। বাবা আপনার কথা শুরু করলে আর থামতে চাননা।'

রঞ্জন স্মিতমুখে বলল, 'সত্যি নাকি ?'

জয়ন্ত বলল, 'আপনার নামটা আমাদের বাড়িতে একটা household word হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন রেডিওতে আপনার বাজনা শুনলুম। বাবাই ধমকে টমকে এনে বসালেন। দেখি, মা দিদি সবাই রেডিওর ধারে গোল হয়ে বসেছে। আমাকেও বসতে হল।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'ধমকের ভয়ে ? বাধ্য হয়ে ?'

জয়ন্ত ও হাসল, 'তা ছাড়া কি। গান-বাজনার কিছু আমি বুঝি না। বিশেষ করে আপনাদের ওই সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ও সব উঁচুতলার লোকের জন্যে। তবে যখন ভাল লাগে শুনি।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'আমার বাজনাটা শুনেছ ? নাকি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?'

একটু খোঁচা খেয়ে যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল জয়ন্ত, বলল, 'ক্লাসি-

ক্যাল গান-বাজনার আসরে শুধু কি আমিই ঘুমোই ? যারা যায় তাদের মধ্যে অন্তত সিক্সটি পার্সেন্ট লোক ঘুমোয়। একবার বাবার সঙ্গে ওই ধরনের আসরে গিয়ে আমার বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দেখি ডায়াসে বসে কে একজন নামকরা আর্টিস্ট গাইছেন, আর আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে এ ওর কাঁধে ঢলে পড়ছে। আপনাদের ক্লাসিক্যাল গানের মধ্যেও ঘুমপাড়ানি গান আছে নাকি ?'

রঞ্জন হেসে উঠল, আছে বইকি। যাক ও সব গান-বাজনার কথা। তুমি কি খাবে বল ? চা না কফি ?

জয়ন্ত বলল, আমি ও সব কিছু খাইনে।

'সেকি ! আজকালকার ছেলেরা তো দেখি চা-কফির ওপরই থাকে !'

জয়ন্ত বলল, ছেলেবেলা থেকে ওসব ব্যান্ করে দিয়ে মা আমাকে বোতল বোতল কেবল দুধ খাইয়েছেন। এখন দুধের ওপরও আমার অরুচি। যাবতীয় তরল পদার্থের ওপর ঘেন্না।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল, আমি এবার চলি। সন্ধ্যাবেলায় তাহলে যাচ্ছেন তো ? না গেলে কিন্তু আমি দলবল নিয়ে আসব। একবার আমাদের ক্লাবের ফাংশনে প্রেসিডেন্টকে আমরা কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছিলাম। কথা দিয়েও তিনি আসতে চাইছিলেন না তাই।

রঞ্জন হেসে বলল, 'আমাকে কিডন্যাপ করতে হবে না। আমি নিজেই যাব। কিন্তু তুমি একটু বোস। আমি আসছি।'

জয়ন্তকে হাত ধরে ফের বসিয়ে দিল রঞ্জন। তারপর ভিতরের দিকে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখল কার্তিক কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। তার সহযোগিনী ময়না বাটনা বাটতে বাটতে বক বক করছে। বউরা ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কাঁদছে কেউ চেঁচাচ্ছে। অন্তঃপুরে যে অর্কেস্ট্রা চলছে তার মধ্যে সুর-সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিংবা

এই অসঙ্গতিই হল সঙ্গতি। এই প্যাণ্ডিমোনিয়ামের মধ্যেই জীবনের ঐকতান।

রঞ্জন অতিথিকে বসিয়ে রেখে নিজেই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু এগোতেই রাস্তার মোড়ে মিষ্টির দোকান। দুটি রসগোল্লা আর দুটি সন্দেশ কিনে মাটির ভাঁড়ে করে নিয়ে এল। কাউকে ডিস্টার্ব না করে খাবারঘরে গিয়ে প্লেটে করে মিষ্টিগুলি সাজিয়ে জলের গ্লাস হাতে ফের এসে দাঁড়াল বসবার ঘরে। সেণ্টার টেবিলের ওপর প্লেট আর গ্লাসটি নামিয়ে রেখে সস্নেহে জয়ন্তের সেই রাজপোশাকের ওপর হাত রেখে বলল, 'খাও। এ গুলি তরল নয়, বায়বীয় নয়, আবার বোধহয় তেমন কঠিনও নয়।'

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'এ কী করেছেন আপনি! একেবারে নিজের হাতে—'

'তাতে কী হয়েছে। তুমি কি ভেবেছ আমি ঠুঁটো জগন্নাথ?'

জয়ন্ত খেতে খেতে বলল, 'তা কেন? তাহলে সেতার বাজাতেন কী করে? সেদিন রেডিওতে ওরা যখন আপনার বাজনা শুনছিলেন, বার বার বলছিলেন কী মিষ্টি। আমার কিন্তু আপনার হাতের এই সন্দেশ-রসগোল্লাগুলিই বেশি মিষ্টি লাগছে।'

রঞ্জন স্মিতমুখে বলল, 'ওগুলি কিন্তু আমার হাতের তৈরী নয় জয়ন্ত! আমাদের কালীময়রা বানিয়েছে।'

জয়ন্ত বলল, 'তা হোক। এনেছেন তো আপনি নিজের হাতে। পরিবেশন করছেন তো স্বয়ং। এর পর আমি বন্ধুদের কাছে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে পারব একজন বিখ্যাত সেতারীর হাতের সন্দেশ খেয়ে এসেছি।'

রঞ্জন বলল, 'বেশ তো, তাই বোল।'

ওকে গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল রঞ্জন। ফিরে আসতে আসতে ভাবল এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। এমন অনেকেই আছে

যারা তার বাজনা বোঝে না, কি বুঝলেও পছন্দ করে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাকে ভালোবাসে। সহৃদয় সজ্জন বলে স্বীকৃতি দেয়। আবার এমনও কেউ কেউ থাকতে পারে, নিশ্চয়ই আছে, যারা তার সুরসৃষ্টিকে কিছুটা সমাদর করে কিন্তু মানুষ হিসাবে মোটেই পছন্দ করে না। কিসে তৃপ্ত হয় রঞ্জন? বলা বড় কঠিন। আমরা একটা পেলে আর একটার জন্যে হাত বাড়াই! যা পাই তার দিকে তাকিয়ে দেখি না, যা পাই না তার জন্যে লুব্ধ হই। রঞ্জনের আকাঙ্ক্ষার কি শেষ আছে? সে একসঙ্গে সব পেতে চায়। ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা প্রীতি সমাদর, শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি। এই প্রাপ্তি দাঁড়ি-পাল্লায় একেবারে সমান ওজনের হবে। এক ছটাকও কম বেশি হলে চলবে না। কিন্তু তাই কি হয়? একসঙ্গে কি সব পাওয়া যায়? কিছু তুমি পাবে, অনেক কিছুই পাবে না এই নিয়ম সংসারের। কারো কারো বেলায় হয়তো এর ব্যতিক্রম হয়। তারা অনেক কিছু পায়, সামান্য কিছু পায় না। কিন্তু সেই সামান্যই তখন অসামান্য হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার পর রঞ্জন ভবেশবাবুর বাড়ির দিকে চলল। কোন একটা অজুহাতে না গেলেও হত। এই সময় বসে সে রেয়াজ করতে পারত, পড়াশুনা করতে পারত, দেশী-বিদেশী কম্পোজারদের যে সব রেকর্ড তার সংগ্রহে আছে তার কিছু কিছু শুনতে পারত কিন্তু মন ছুটে চলেছে একটি অপরিচিত গৃহের দিকে। আজ সেখানে সে আমন্ত্রিত। সেই গৃহের দুটি অধিবাসীর সঙ্গে তার পরিচয় রয়েছে। সে পরিচয় শ্রদ্ধা প্রীতির পারস্পরিকতায় অভিষিক্ত। আর দুজনের সঙ্গে এখনো পরিচয় বাকি। কী সেখানে গিয়ে দেখবে রঞ্জন? কোন এমন অপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব রহস্য সেখানে তাব জন্যে অপেক্ষা করছে? হয়তো কিছুই না। তবু প্রত্যাশার অন্ত নেই। এই পার্ক পেরিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা ঘাসে ঢাকা জমিটুকু পেরিয়ে সে যেন পাড়ার অদূরবর্তী একটি ফ্ল্যাট

বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না, যেন কোন দূর দেশের অভিযাত্রী হয়েছে। এই কল্পনাপ্রবণতা এই রোমান্টিক সত্তা যেন তার নাড়ির সঙ্গে জড়িত। এই জট কিছুতেই ছাড়াবার উপায় নেই। প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য নাকি বিসদৃশতা তাকে বহুবার বহুপ্রকারে বিড়ম্বিত করেছে কিন্তু সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেনি। এখনো প্রতিটি অপরিচিত গৃহ তার কাছে নতুন পৃথিবী বলে মনে হয়। প্রতিটি নব পরিচয় তাকে কিছু না কিছু দেয়।

এই ভাড়াটে ফ্ল্যাট-বাড়িটায় এর আগেও এসেছে রঞ্জন। তখন ভবেশবাবুরা ছিলেন না। কিছু কিছু চেনা পরিবার এ বাড়ি থেকে উঠে গেছে। অচেনারা এসে তাদের জায়গা দখল করেছে।

গেটে আলো আছে। দোতলার সিঁড়িতেও আলো আছে।

উঠে গিয়ে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটির সামনে দাঁড়াল রঞ্জন।

দোরে কড়া লাগানো আছে। বাঁ দিকে ওপরে কলিংবেল। অনেক বাড়ির কলিংবেলই সুখশ্রাব্য নয়। ভবেশবাবুর কলিংবেলের ওপর দিয়ে পরীক্ষা না চালিয়ে সে মৃদুভাবে কড়া নাড়ল।

একটু বাদে দরজা খুলে গেল।

মনে হল একটি নারীমূর্তি দ্রুতপায়ে আবছায়ার মত সরে গেল। তারপর ভবেশবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোচ্ছ্বাসে সামনে এসে দাঁড়ালেন 'আসুন আসুন। আমরা কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। কেবল ভাবছি আপনি আসবেন কিনা। চিনে আসতে পারবেন কিনা। জয়ন্তটা একটা জন্তু। ওকে বার বার বললাম রঞ্জনবাবুকে একটা রিকশা করে নিয়ে আয়। বন্ধুদের ডাকে কোথায় বেরিয়ে পড়ল। পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন দিনরাত কেবল আড্ডা আর আড্ডা।'

নিজের বাড়িতে রঞ্জনের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ আছে।

'আপনার পা কেমন আছে?'

ভবেশবাবু বললেন, 'বোধহয় মচকেছে। ভাঙে নি।' তিনি রঞ্জনকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

যে ছায়ামূর্তিটা একটু আগে দেখেছে সেটি এবার পরিপূর্ণ কায়া ধরেছে। মহিলাটি সুশ্রী। অসাধারণ না হলেও সুন্দরী। গায়ের রং গৌর, দীর্ঘাঙ্গী। মাথায় আঁচল নেই, সিঁথিতে সিঁদূর তেমন স্পষ্ট নয়। ওষ্ঠরঞ্জনী বরং আর একটু স্পষ্ট। তাহলেও পাতলা সুগঠিত সুন্দর ঠোঁট ছুটিতে বেশ মানিয়েছে।

মহিলাটি নমস্কার জানিয়ে একটু হেসে বললেন, 'আসুন. আমরা অনেক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছি।'

পরিচয় করাবার দরকার ছিল না। তবু করানোটা শিষ্টাচার। ভবেশবাবু সেই আচারটুকু রক্ষা করে বললেন, 'ইন্দ্রাণী, আমার স্ত্রী। বলে দিতে হয় রঞ্জনবাবু। নইলে লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না। যারা স্কেপটিক তারা বললেও বিশ্বাস করে না।'

ইন্দ্রাণী অপরূপ ভ্রূ-ভঙ্গিতে স্বামীকে শাসন করলেন, 'কী হচ্ছে? তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান হবে না? উনি এই প্রথম এলেন।'

ভবেশবাবু একথার কোন জবাব দিলেন না। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মিনি কই? মিনি?'

সামনে তাকে দেখতে না পেয়ে একটু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'মিনি!'

ইন্দ্রাণী স্বামীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'অমন করে ডাকছ কেন? মিনি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি। ঘরেই আছে।'

তারপর রঞ্জনের দিকে চেয়ে কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আমার মেয়ে একটু shy, সহজে কারো সামনে আসতে পারে না।'

কথা বলতে বলতে রঞ্জনকে ওঁরা বাঁদিকের ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেছেন। মেঝেয় কার্পেট পাতা, ছুদিকে ছুখানি সোফা, ঢাকনিগুলি হালকা গোলাপী রঙের। সেই সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেছে ঘরের জানলা-

দরজার পর্দাগুলি। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে কাঁচের বুকসেলফ। তার ভিতরে রবীন্দ্ররচনাবলীর খণ্ডগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সেলফের ওপরে মাঝারি সাইজের একটি সুদৃশ্য রেডিও সেট। পাশে ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে। ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। রঞ্জনের মনে হল এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী শুধু নিজেই সাজতে ভালোবাসেন না, গৃহ সজ্জাতেও তিনি সমান মনোযোগিনী আর সুনিপুণা।

এবার দক্ষিণ দিকের পর্দা সরিয়ে একটি তরুণী মেয়ে এসে দাঁড়াল। রঞ্জন যেন ওর জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল। মেয়েটি কিন্তু রূপের দিক থেকে ঠিক প্রত্যাশা পূরণ করে না। বিশেষ করে যেখানে ওর বাবা সুপুরুষ, মা রূপবতী, ভাই সুদর্শন, এই মেয়েটি সেই তুলনায় অসুন্দরী না হয়েও অনুপমা, রূপের বিচারে চারজনের মধ্যে চতুর্থ।

এই ভাবনার উদ্রেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হল রঞ্জন। মিউজিক কমপিটিশনের আসরে মাঝে তাকে বিচারকের আসনে বসতে হয়েছে। নিজে কোনদিন পুরস্কার না পেলেও পুরস্কার বিতরণ করেছে বিজয়া-বিজয়ীনীদের। কিন্তু রূপের বিচার করবার ভার তাকে কে দিল? রূপের বিচারে সে-ও কি একান্ত ভাবে ট্রাডিশনাল নয়?

ততক্ষণে ভবেশবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে সাদরে ডেকে আনলেন। যেন সে-ও এ বাড়ির অতিথি। হাতখানা বাড়িয়ে তার কাঁধ বেষ্টন করে তাকে এগিয়ে আনলেন, 'আয় মা কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আয়, পরিচয় করিয়ে দিই। রঞ্জনবাবু, এটি আমার পোষা বেড়াল মিনি। পোশাকি নাম নন্দিতা। আপনি কিন্তু ওর এই ডাক-নামটা মনে রাখবেন না, মুখেও আনবেন না। এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেবেন। ও নাম ওর পছন্দ নয়, ওতে ওর প্রেসটিজের হানি।'

ভবেশবাবুর মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

চির-চেনা বাৎসল্য। এর মধ্যে অপূর্বতা নেই। কিন্তু কোথায় যেন একটু অনন্যতা আছে।

অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সামনে এতখানি পিতৃস্নেহ নন্দিতার বোধহয় তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। সে যেন বিব্রত বোধ করছিল।

নন্দিতা স্মিতমুখে করজোড়ে নমস্কার জানাল।

কিন্তু ভবেশবাবু বললেন, 'ও কি হচ্ছে মা। ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর। উনি তোমার চেয়ে কত বড়। এক হিসেবে তো গুরুর গুরু। ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।'

অপ্রস্তুত নন্দিতা নত হয়ে রঞ্জনকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, বাধা দিতে গিয়ে রঞ্জন তাড়াতাড়ি ওর হাতখানা ধরে ফেলল। ধরেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল।

এবার অপ্রস্তুত হবার পালা রঞ্জনের।

ভবেশবাবু বললেন, 'আপত্তি করছেন কেন? দিন না পায়ের ধুলো নিতে।'

রঞ্জন বলল, 'ওসব প্রণাম-ট্রণাম আবার কেন?'

কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে রঞ্জন তার বক্তব্যকে আর একটু বিস্তৃত করল, 'আমি প্রণাম চাইনে।'

ভবেশবাবু বললেন, 'তবে কি চান?'

রঞ্জন চট করে জবাব দিতে পারল না।

ইন্দ্রাণী তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। হেসে বললেন 'উনি এখন চা চান। এখনো উনি চা-টা খেলেন না। কী কেবল বক বক করছ?'

তারপর রঞ্জনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'চা না কফি? আপনি কী ভালোবাসেন?'

রঞ্জন জবাব দিল, 'আমার হোস্টেস যা দিতে ভালোবাসেন—'

ইন্দ্রাণীর দুই চোখে যেন বিদ্যুৎপ্রভা ঝলকে উঠল, 'হুঁ কথাটা মনে থাকে যেন।'

একটু থেমে বললেন, 'আমি যখন যা দেব সবই কিন্তু আপনাকে খেতে হবে!'

রঞ্জন লক্ষ্য করেছে মা মেয়ে দুজনের চোখই সুন্দর। দুজনেই আয়তাক্ষী। কিন্তু একজনের চোখে আলো, আর একজনের চোখে ছায়া। রঞ্জনের মনে হল সেই ছায়াচ্ছন্নতা যেন আরো রহস্যে গভীর।

পরিচারিকা একটি আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণী নিজের হাতে ট্রেতে করে সুন্দর সুদৃশ্য দুগ্ধধবল টিপট আর চায়ের কাপগুলি হাতে নিয়ে এলেন। কাপগুলি ফুটন্ত শ্বেত-পদ্মের মত।

নিজের হাতে পট থেকে চা ঢেলে দিলেন ইন্দ্রাণী। রঞ্জনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ক চামচ চিনি দেব আপনাকে?'

'দিন যা হয়।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'এও কি হোস্টেসের মর্জি অনুযায়ী নাকি? যদি এক চামচ বেশি দিয়ে ফেলি, আপনার চা যদি শরবত হয়ে যায়, দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু।'

চা খেতে খেতে ভবেশবাবু বললেন, 'প্রণামের কথা বলছিলেন রঞ্জনবাবু। একসময় আমিও কিন্তু প্রণাম ট্রণাম পছন্দ করতাম না। আত্মীয়-স্বজন গণ্ডির বাইরে কাউকে প্রণাম সহজে করতামও না, চাইতামও না। কিন্তু বয়েস যত বাড়ছে তত যেন ওসব দিকে লোভ হচ্ছে। ছেলে-ছোকারা কেউ যদি নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে আসে মনে মনে খুশিই হই। এই নম্রতা তো আজকাল দুর্লভ। যা দুর্লভ তাই আমাদের লোভের বস্তু। আরও একটা কথা।' ভবেশবাবু সকলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলবার লোক এখন কমে যাচ্ছে, হাতে হাত রাখবার বন্ধুও বিরল, কেউ যদি

পায়ে হাত দিয়ে একটু ছোঁয়, তবু তো একটু স্পর্শ পাই। আমরা কি সকলে স্পর্শের কাঙাল নই রঞ্জনবাবু?'

ইন্দ্রাণী স্মিতমুখে বললেন, 'তাই বলে তোমার মত কেউ না। জানেন, ছেলে-মেয়েরা যখন ছোট ছিল, তখন উনি ওদের ধারে কাছেও ঘেঁষতেন না। এখন ওরা বড় হবার পর হঠাৎ ওঁর মধ্যে পিতৃত্ব জেগে উঠেছে। এখন কত আদর আহ্লাদ সোহাগ সমাদর। কিন্তু ওদের তো ওসব পাওয়ার অভ্যাস নেই। ওদের অত সইবে কেন? ওদের সুড়সুড়ি লাগে।'

সুড়সুড়ি কথাটা যেন রঞ্জনকে সুড়সুড়ি দিল। সবায়ের সঙ্গে সেও হেসে উঠল।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'এবার খাবার এনে দিই।'

রঞ্জন বলল, 'খাবার আবার কেন? এই তো খেলাম।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'ও তো পান করলেন। এবার খাবেন কুমড়ো-ঘণ্ট, ডাঁটা-চচ্চড়ি। আপনি তো বলেছেন আমি যা ভালোবেসে দেব তাই আপনি হাত পেতে নেবেন।'

রঞ্জন বলল 'এখন ওসব থাক।'

'এখন নয় তো কখন?'

ভবেশবাবু বললেন, 'আঃ কেন পীড়াপীড়ি করছ? উনি যদি একটু পরে খেতে চান তাই খাবেন। এখন বরং গান-বাজনা হোক।'

রঞ্জন বলল, 'সেই ভালো। যে জন্যে এসেছি।'

পশ্চিমের দেওয়ালে হুকে ঝোলানো ঢাকনিতে ঢাকা সেতারটি আগেই দেখেছে রঞ্জন। এবার সেটি দেখিয়ে বলল, 'পাড়ুন যন্ত্রটিকে। আবরণ উন্মোচন করুন।'

ভবেশবাবু হাতজোড় করে বললেন, 'আজ থাক। রেয়াজ টেয়াজ কিছু হয়নি।'

রঞ্জন এবার শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে ছাত্রকে শাসন করছে, হেসে

বলল, 'কেন হয়নি? আপনি না হয় পায়েই সামান্য চোট পেয়েছেন, হাতে তো কিছু হয়নি।'

নন্দিতা এতক্ষণে কথা বলল। বাপকে একই সঙ্গে অভিযুক্ত আর মুক্ত করে বলল, 'বাবার কথা বলবেন না। ওঁর সবই খেয়াল।'

ভবেশবাবু বললেন, 'তুমিই কি কম খেয়ালী মা? রঞ্জনবাবু, আজ আমার সেতারের পরীক্ষা থাকুক, আজ আপনি আমার মেয়ের গান শুনুন।'

রঞ্জন বলল, 'সে শুনব। কিন্তু আপনি পাড়ুন সেতারটা। ভয় নেই, আপনাকে বাজাতে বলব না। দেখি যন্ত্রটা কি অবস্থায় আছে।'

সেতারটা পেড়ে এনে ভবেশবাবু তার ঢাকনি খুলে যন্ত্রটি রঞ্জনের হাতে দিলেন।

রঞ্জন বলল, 'বাঃ, ঢাকনিটিতো বড় সুন্দর। চারদিকে এমব্রয়-ডারির কাজও আছে।'

ভবেশবাবু স্মিত প্রসন্নমুখে বললেন, 'মেয়ে করে দিয়েছে। কিন্তু ওই ঢাকনিই সব। বুঝলেন রঞ্জনবাবু। হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যম্যয়-পিহিতং মুখম্। বাইরের আবরণ দেখেই মুগ্ধ। ভিতরে আর যেতে পারলাম না।'

রঞ্জন নিজেও কি তাই নয়। কিন্তু ভিতরে যেতে পারেননি বলে ভবেশবাবুর গলায় খুব যে একটা ক্ষোভ ফুটে উঠল তা নয়। মুখে যাই বলুন, রঞ্জন ভাবল নিশ্চয়ই উনি বিকল্প কিছু পেয়েছেন।

সেতারটি হাতে তুলে নিল রঞ্জন। তারে আঙুল বসাল। [illegible]নাহত যন্ত্র গুঞ্জন তুলল না। অশ্রুত ধ্বনি রঞ্জনের মনের মধ্যে অনুরণিত হতে লাগল। একটু আগে নারীর কোমল স্পর্শ সে অনুভব করেছে। এই প্রিয় যন্ত্রটির স্পর্শ কি তার চেয়ে কোমলতর নয়? নাকি এই স্পর্শের অনুভূতি আলাদা? অনুভবকারীও কি দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি?

নন্দিতা বলল, 'আপনি তাহলে বাজান, আমরা শুনি।'

অতি সামান্য অনুরোধ। হয়তো নিতান্তই সৌজন্যসূচক। কিন্তু এই একটা স্বরাঘাতে রঞ্জনের অন্তরবীণা যেন নতুন সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। কিন্তু হাতের সেতারটি সে সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে বসল না।

রঞ্জন মৃদু হেসে বলল, 'আজ তো আমার বাজাবার কথা নয়। আজ আপনি গাইবেন আমরা শুনব।'

ভবেশবাবু হেসে উঠলেন, 'সে কি রঞ্জনবাবু, আমাদের মিনিকে 'আপনি' বলছেন আপনি! ওকে যে আপনি আকাশে তুলে দিলেন। এমনিতেই গর্বে ওর মাটিতে পা পড়ে না। এরপর কি আমরা ওর নাগাল পাব? ওকে 'তুমি'ই বলবেন আপনি।'

নন্দিতা ভবেশবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেন বাবা, কেউ যদি আমাকে 'আপনি' বলেনই, তোমার অত হিংসে কিসের?'

ভবেশবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। আপনি টাপনি হবার ইচ্ছা তোর এখন হতেই পারে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। সোজা কথা নাকি। ওরে বাপরে! আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি তখন এক ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম তিনি আমাকে 'ভবেশবাবু' বলে ডাকলেন। ওঃ সে কী আনন্দ। তারপর থেকে আমি আশা করতে লাগলাম প্রত্যেক অপরিচিত ভদ্রলোকই আমাকে ওই রকম সম্মান দেবেন।'

ইন্দ্রাণী স্বামীর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে মৃদু ধমকের সুরে বললেন, 'রাখো তো তোমার সেকেলে গল্প। কথায় কথায় কেবল আমি কী ছিলাম, আমি কী করে ছিলাম—কে শুনতে চায় ও সব। তোমরা তো বুড়ো বয়সে সব কলেজে ঢুকেছিলে। বাবু বলবে না তো কি বলবে। এখন কি আর সেই দিন আছে নাকি? মিনি একখানা গান গাবি তো গা। নইলে আয় আমার সঙ্গে। আমাকে একটু হেল্প কর এসে।'

ছোট একখানা তক্তপোষ দেয়াল ঘেঁষে পাতা। তার তলা থেকে

হারমোনিয়ামটি টেনে বার করল নন্দিতা। তলার হারমোনিয়াম ওপরে উঠল। উঁচুতে উঠে বসতে হল গায়িকাকেও।

ভবেশবাবু বললেন, 'এটি হল আমাদের পারিবারিক ডায়াস।'

নীল রঙের একসারসাইজ খাতাটি হারমোনিয়ামের ওপর রেখে পাতা ওল্টাতে লাগল নন্দিতা। তারপর রঞ্জনের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি কিন্তু গাইতে পারিনে। সবে শিখতে শুরু করেছি। বাইরের কারো কাছে গাই না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'ওঁকে বাইরের কেউ বলে ভাবছ কেন মিনি? উনিও আমাদের ঘরের মানুষ। ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড।'

'কোন গানটা গাইব বাবা?' নন্দিতা জিজ্ঞাসা করল।

ভবেশবাবু নালিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'গান গাইবে ও, কথা বলে দিতে হবে আমাকে! সেই গানটা গা না। সেই আমার মুক্তি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘরে বন্দী হয়ে আছি। কবে বেরোতে পারব কে জানে। সেই মুক্তির গানটাই শোনা।'

নন্দিতা শুরু করল, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।'

কেদারা রাগ।

রঞ্জন সেতারে সেই গানের প্রতিধ্বনি করতে লাগল। তার সেতারেও বাজতে লাগল 'আমার মুক্তি গানের সুরে ঊর্ধ্বে ভাসে।'

একটু আগেও তার চিত্ত কিন্তু অতীন্দ্রিয়তার এই ঊর্ধ্বলোকে ছিল না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির এপার-ওপারের ব্যবধান কখনো মনে হয় দুস্তর, কখনো মনে হয় সেতারের একটি তারের মতই সূক্ষ্ম সূতায় তার সীমা-রেখা।

গান শেষ করে নন্দিতা অবাক হয়ে তাকাল রঞ্জনের দিকে, মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি সেতারে বাজালেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত?'

রঞ্জনের মনে হল ওর গানের গলা আর কথা বলার গলায় কোন তফাত নেই। দুই-ই সমান মধুর।

রঞ্জন বলল, 'তাই তো বাজালাম। তোমাদের তানপুরাটি তো দেখছি না।'

নন্দিতা বলল, 'তানপুরা আমাদের নেই। এর আগে আমি গীটারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনেছি। কিন্তু সেতারে কখনো শুনিনি। সেতারেও যে এমন করে বাজানো যায়, আর এমন অপূর্ব—'

কথা খুঁজে না পেয়ে নন্দিতা থেমে গেল।

তারপর পরম উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'আপনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভালোবাসেন তাহলে।'

রঞ্জন আবেগের সঙ্গে বলল, 'I love it passonately'

নন্দিতা কি ভেবে চোখ নামিয়ে নিল।

অপ্রস্তুত হল রঞ্জন। 'প্যাশন' কথাটায় ও কি লজ্জা পেয়েছে? ইংরেজি কথা বাঙালীদের কাছে রঞ্জন সাধারণত বলে না। পুরো একটি বাক্য তো নয়ই। কিন্তু 'প্যাশন' শব্দটি ব্যবহার করতে তার ভালো লাগে। আর এর বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। যা আছে তা রঞ্জনের পছন্দ নয়। একদিন কৌতূহলী হয়ে ডিক্সনারী খুলেছিল। শব্দটির প্রচলিত দ্বিতীয় অর্থ তীব্র প্রণয় ও আসক্তি। অপ্রচলিত মূল অর্থটি কিন্তু অন্য রকম। তার অর্থগৌরব আরও বেশী। ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার পর যীশুখ্রীস্টের যন্ত্রণা ও মৃত্যু। প্যাশনে আনন্দ যেমন আছে যন্ত্রণা আর মৃত্যুও তেমনি আছে। কিন্তু সব প্যাশনই কি আর যীশুখ্রীস্টের প্যাশন? সব মৃত্যুই কি আর যীশু-খ্রীস্টের মহিমা পায়?

নন্দিতা চোখ তুলে তাকাল। স্নিগ্ধ সুন্দর আয়ত ঘন কালো দুটি চোখ রঞ্জন আবার লক্ষ্য করল।

নন্দিতা বলল, 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের মুখে কিন্তু এমন কথা শুনিনি।'

রঞ্জন বলল, 'সবাই তো সমান নয়। আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। একটু অন্য অর্থে রবীন্দ্র-সঙ্গীতও অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত।'

নন্দিতা বলল, 'আপনি এমন করে সেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাইরে কোথাও বাজাতে পারেন?'

রঞ্জন বলল, 'তা হয়তো পারিনে। সব বাজনাই তো আর বাইরের জন্যে নয়।'

নন্দিতা বলল, 'ঘরের জন্যে। আমিও তো ঘরেই গাই। আপনি আমাদের ঘরে আবার বাজাবেন?'

ভবেশবাবুও যোগ দিলেন। গান-বাজনার আলোচনা হয়তো আরো অনেকক্ষণ চলত, কিন্তু রাত বেড়ে যাচ্ছে দেখে ইন্দ্রাণী মেয়ের সাহায্য ছাড়াই খাবারগুলি রান্নাঘর থেকে এ ঘরে নিয়ে এলেন। পরিচারিকাকে বললেন, 'শ্যামা, জলের গ্লাসটা নিয়ে আয়। আর ছোট টুলটা—'

একটা টুলে কুলোল না আরো একটি টুল আনতে হল। বাটির পর বাটি, বাটির পর বাটি। আমিষ-নিরামিষ, লুচি-মাংস, মোহন-ভোগ, রসগোল্লার পায়েস।

রঞ্জন বলল, 'এ করেছেন কি! এ সব কে খাবে?'.

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'মনে আছে আপনি কথা দিয়েছেন আমি যা দেব আপনি ভালো ছেলে গোপালের মত খেয়ে যাবেন। একবারও মাথা নাড়তে পারবেন না।'

রঞ্জন বলল' সব নিজের হাতে করেছেন?'

ইন্দ্রাণী স্মিতমুখে বললেন, 'আর কার হাত ধার করতে যাব?'

শ্যামা অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, 'মা আমাকে আজ কিচ্ছু করতে দেননি।'

ভবেশবাবু স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'সত্যি এ বড় অন্যায় ইন্দু। অন্য সব দিন সাধারণ আটপৌরে রান্নাগুলি ও রাঁধবে আর বিশেষ দিনেব ষোল আনা কৃতিত্ব নেবে তুমি ?'

রঞ্জন বলল, 'বিশেষ দিন ! আজ কি আপনাদের কারো জন্মদিন নাকি ?'

ভবেশবাবু বললেন, 'না না।'

'তবে কি বিবাহ-বার্ষিকী ?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বার্ষিকী-টার্ষিকী কবে উঠে গেছে।'

বঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'তবে আজ কী ?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আজ আপনার আবির্ভাব উৎসব।' রঞ্জন ইন্দ্রাণীব সুন্দর সুপ্রসাধিত কৌতুক-উজ্জ্বল মুখখানিব দিকে একটু কাল তাকিয়ে রইল। তারপর একটু আহতস্বরে বলল, 'আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?'

ইন্দ্রাণী রঞ্জনের দিকে তাকালেন। তারপর স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি এতই অবুঝ কোনটা ঠাট্টা, কোনটা ঠাট্টা নয়, তা বুঝতে পারবেন না ? আপনি এসেছেন এতে আমরা যে কত আনন্দ পেয়েছি কী করে বোঝাব ? আমি তো আমার স্বামীর মত লেখাপড়া জানিনে, আমার মেয়ের মত গাইতে জানিনে, আমি কী দিয়ে আপনার সমাদর করব ? আমি যা জানি আপনার জন্যে করে এনেছি। কিন্তু আপনি তো ভাল করে কিছু খেলেনই না। সবই তো প্রায় পড়ে রইল।'

রঞ্জন একটু লজ্জিত হল। তারপর সবিনয়ে মার্জনা চাইবার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার রান্নাগুলি সত্যিই চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আপনি যে স্তরের উচ্চাঙ্গের শিল্পী আমি ঠিক সেই স্তরের সমঝদার নই। এ ব্যাপারে আমাকে অশিক্ষিতই বলতে পারেন।'

ভবেশবাবু বললেন, 'আর একটু খেলে পারতেন। বেচারা এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে এসে কষ্ট করে সব করেছে—।'

একটু অবাক হয়ে রঞ্জন বলল, 'অফিস? ওঁরও অফিস আছে নাকি?'

ভবেশবাবু বললেন, 'আছে বইকি। আপনি কি ভেবেছেন শুধু আমাদের ফিস ফিস করেই দিন কাটে?'

মেয়ে যে সামনে আছে সে কথা ইঙ্গিতে স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী মৃদুস্বরে বললেন, 'আঃ।'

রঞ্জন বলল, 'কোন অফিসে চাকরি ওঁর?'

ভবেশবাবু বললেন, 'আমারই মত একটা সওদাগরী অফিস। তবে উনি বড় গাছে নৌকো বেঁধেছেন। কাজটা অবশ্য রিসেপ-সনিস্টের। আসলে ছোটোখাটো পি আর ও। জনসংযোগে সহ-যোগিনী।'

স্ত্রীর গৌরব বাড়িয়ে দিলেন ভবেশবাবু।

প্রতিবাদ করে ইন্দ্রাণী সবিনয়ে বললেন, 'ওঁর কথা শুনবেন না। আমি সামান্য চাকরি করি।'

রঞ্জন বলল, 'চাকরিতে কি এসে যায়। আপনি নিজে তো অসামান্য।'

ইন্দ্রাণী হাসলেন, 'আপনি শুধু সেতার বাজাতেই শেখেন নি।'

'আর কি শিখেছি?'

'ভাল ভাল কথা বলতেও শিখেছেন। আপনি জানেন দেবতাদের মত মেয়েরাও স্তবে তুষ্ট।'

রঞ্জনকে সঙ্গে করে বাথরুমে নিয়ে গেলেন ইন্দ্রাণী। ছোট্ট বাথরুম। তবে মুখ ধোবার বেসিন আছে।

মুখ ধোবার পর নিজে হাতে তোয়ালে এগিয়ে দিলেন রঞ্জনকে।

এমন যত্ন অতিথিকে সবাই করে। রঞ্জনও কত জায়গায় এমন আদর-যত্ন পেয়েছে। তবু তার মনে হচ্ছিল যেন নতুন কিছু পাচ্ছে। প্রতিবারের হারানো যেমন নতুন দুঃখ দেয়, প্রতিবারের প্রাপ্তিও কি তেমনি আনন্দে মনকে ভরে তোলে না।

রঞ্জন ভাবল রিসেপসনিস্টের কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ইন্দ্রাণী। তাই এত সাজ-সজ্জা। হয়তো অফিসের দরকারেই গোড়াতে শুরু করেছিল। পর রুচি পরনা। তারপর সেই রুচি আপন রুচি হয়ে উঠেছে। অফিসে কাজ করতে গিয়ে। আয়ত্ত করেছেন সপ্রতিভতা। তা কোন কোন মুহূর্তে প্রগলভতার সীমান্ত ছুঁই ছুঁই করে আবার তাকে সুকৌশলে সংযত করে আনেন। মেয়েরা যেমন মাথার আঁচল ফেলে দিয়ে আবার তা সঙ্গে সঙ্গে তুলে দেয়। একটু অসম্বৃত হয়ে আবার নিজেকে সম্বৃত করে। আর্টও তো তাই। সংযম অসংযমের লীলা। জীবনও কি তাই নয়?

রঞ্জন খাবার ঘরে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'ইনি বাইরে অভ্যর্থনা-কারিণী, ঘরেও অভ্যর্থনা-কারিণী। রিসেপসন কমিটির স্থায়ী প্রেসিডেন্ট।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'প্রেসিডেন্ট না আর কিছু! অর্ডিনারি একজন মেম্বারের সম্মানও কপালে জোটে না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন রঞ্জনবাবু।'

রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বলল 'না, আর বসব না। অনেক রাত হয়েছে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বলল, 'পৌনে দশটা।'

ভবেশবাবু হেসে বললেন, 'গাইয়ে-বাজিয়েদের কাছে এইটুকু রাত আবার রাত নাকি?'

রঞ্জন একটু হেসে কৈফিয়তের সুরে বলল, 'কাজ আছে যে বাড়িতে।'

'ওঃ, রেয়াজ করবেন বুঝি? তাহলে যান, তাহলে যান, তাহলে

আর আপনাকে আটকে রাখব না। কিন্তু চলুন, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।'

হঠাৎ দক্ষিণের পর্দাটি আবার নড়ে উঠল। উইংসের পাশ দিয়ে রাজকীয় পূর্ণ মহিমায় এসে স্টেজে দাঁড়াল জয়ন্ত।

'বাবা তোমায় যেতে হবে না। আমি ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি।'

ভবেশবাবু বললেন, 'তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কখন এলি?'

জয়ন্ত বলল, 'এসেছি অনেকক্ষণ। পাশের ঘরে বসে বসে অ্যাডভেঞ্চারের বইটা পড়ছিলাম। কী চমৎকার লেখা। এ ঘরে এলেই তো কেবল গান আর বাজনা, গান আর বাজনা। শুনে শুনে কান পচে গেল।'

ভবেশবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'জয়ন্ত তুমি আজও ম্যানার্স শিখলে না। একজন মিউজিসিয়ানের সামনে তুমি এসব কী বলছ?'

রঞ্জন এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ জয়ন্ত। আমারও মাঝে মাঝে কান পচে যায়। আমারও মাঝে মাঝে প্রাণ অন্য কিছুর জন্যে আনচান করে। চল তোমার যদি অসুবিধে না হয় আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।'

ভবেশবাবু বললেন, 'অসুবিধে আবার কিসের। তবে রাস্তায় জল জমা হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই তো এ মুল্লুকের সব রাস্তা এক একটি সুয়েজ ক্যানাল। একটা রিক্সা নিয়ে যাস।'

ভাগ্যক্রমে রিকসা একটা বাড়ি থেকে বেরিয়েই পাওয়া গেল। জয়ন্ত আগে রঞ্জনকে তাতে তুলে দিয়ে নিজে তার পাশে উঠে বসল। তারপর একটু যেন অসন্তোষের সুরে বলল, 'জানেন, আমি পারত-পক্ষে রিক্সায় উঠিনে। রিক্সায় উঠতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না।'

রঞ্জন স্নিগ্ধ কৌতুকের সুরে বলল, 'তবে কিসে উঠতে ভাল লাগে ?'

জয়ন্ত বলল, 'জাহাজে।'

রঞ্জন বলল, 'ও, তুমি তো ভাল এনজিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, ভবেশবাবু বলেছিলেন বটে। জাহাজে তো তুমি উঠবেই।'

জয়ন্ত বলল, 'জাহাজে আমি উঠেছি। তবে সে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ। তাতে উঠে কি আনন্দ আছে ? তবে এবার কথা হয়েছে আমাদের কাজকর্ম শেখাবার জন্যে কোচিন পোর্টে নিয়ে যাবে। কী মজা। যাবেন আপনি আমাদের সঙ্গে ?'

রঞ্জন বলল, 'আমি আদার ব্যাপারী। আমাকে নেবে কেন তোমাদের জাহাজে ?'

জয়ন্ত বলল, 'আমরা তেমন করে ধরলে নিশ্চয়ই নেবে। আমাদের এসোশিয়েশন আছে। তাছাড়া আপনি একজন আর্টিস্ট ! আপনি যেতে চাইলে গ্ল্যাড্‌লি ওরা রাজী হয়ে যাবে। শান্ত সমুদ্রে উঠে লাভ নেই। আমি চাই ঝড়ের সমুদ্র। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় জাহাজ দুলতে থাকবে। আর আপনি ডেকে বসে সেতার বাজাবেন। ভয় করবে নাকি আপনার ?'

রঞ্জন বলল, 'তুমিই তো থাকবে সঙ্গে। ভয় কিসের ?'

জয়ন্ত যেন এখনই সেই জাহাজে উঠে বসেছে।

এই জল-কাদা ভরা পথকে ভবেশবাবু বলেছিলেন স্যুয়েজ খাল, জয়ন্ত তাকে মহাসমুদ্র বানিয়েছে।

জয়ন্ত বলতে লাগল, 'বাবা-মার সঙ্গে ছেলেবেলায় আমরা একবার পুরীতে গিয়েছিলাম। সমুদ্রে চান করতে গিয়ে ডুবে মরে ছিলাম আর কি। নুলিয়া তুলে এনেছিল। সেই থেকে মা-র সমুদ্রকে ভয়। কিন্তু আমি জোর করে ভর্তি হয়েছি ন্যাভাল এনঞ্জি-নিয়ারিংয়ের ক্লাসে। জাহাজ নিয়ে সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়াব বলে। সমুদ্রের সঙ্গে আমার যুদ্ধ, সমুদ্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।'

রঞ্জন বলল, 'তুমি কি কবিতা লেখো নাকি জয়ন্ত ?'

জয়ন্ত লজ্জিত হয়ে বলল, 'আগে লিখতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'তুমি ধরলেই বা কবে, ছাড়লেই বা কবে ? তোমার তো আগাগোড়াটাই শুরু।'

রঞ্জনের নিজের সম্বন্ধে একথা কেউ আর বলবে না। সে নিজেও বলে না। তবু বাজাতে বসে সে মাঝে মাঝে প্রথমারম্ভের আনন্দ পায়। প্রথম প্রেমের।

॥ ৩ ॥

ভবেশবাবুর পা-টা যতদিন না সারল রঞ্জনকে ওঁদের বাড়িতেই যেতে হল ওঁকে শেখাবার জন্যে। এমন আন্তরিক অনুরোধ যে না গিয়ে পারে না। এটা অবশ্য তার নতুন নয়। কোন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে তার বাড়িতে না আসতে পারলে তারা যদি চায় আর রঞ্জনের যদি হাতে সময় থাকে সে নিজেই গিয়ে শিখিয়ে আসে। ভবেশবাবুর বয়সী ছাত্র কি তাঁর চেয়েও বেশি বয়সী ছাত্র রঞ্জনের আরো আছে। কেউ কেউ অফিসের বড় চাকুরে। কেউ কেউ অফিস থেকে রিটায়ার করেছেন। সেতার শিক্ষা এঁদের শখের জন্যে অবসর বিনোদনের জন্যে। কিন্তু রঞ্জনের তো তা নয়। সেতার একই সঙ্গে তার জীবিকা আর জীবনের সর্বপ্রধান অঙ্গ। একমাত্র অঙ্গ করে তুলতে পারলেই যেন ভালো হত। বিয়ে না করলেও সে তো গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়নি। সংসার সমাজের মধ্যেই বাস করছে। সেই অলৌকিক সাধ আর স্বপ্নের তটভূমি বার বার লৌকিক দাবির তরঙ্গে প্লাবিত হয়ে যায়। পারিবারিক দাবি সামাজিক দাবি। শুধু কি তাই ? তার সুপ্ত অবদমিত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পীড়নই কি কিছু কম ? একবার সে দেরাদুনের কাছে সহস্রধারা দেখতে গিয়েছিল। পাহাড় থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ঝরনা বেরিয়েছে।

অপূর্ব দেখতে। তার মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনও সেই সহস্রধারা। স্থূল সূক্ষ্ম সহস্র কামনা-বাসনার উৎসভূমি।

আশ্চর্য, ভবেশবাবু পদস্থ হওয়ার পরেও রঞ্জনকে ছেড়ে দিলেন না। সবিনয়ে বললেন, 'একটু অসুবিধে করেও আপনি যদি আসেন রঞ্জনবাবু, খুব আনন্দ হবে আমাদের।'

ভবেশবাবু করলেন অনুরোধ, তাঁর স্ত্রী করলেন দাবি, 'উনি আপনার বাড়িতে গেলে শুধু উনিই শিখবেন। যা কিছু পাওয়ার উনিই পাবেন। আমরা একেবারে বঞ্চিত হব।'

রঞ্জন হেসে বলেছিল, 'বেশ তো আপনারাও আসুন না। ভর্তি হন আমার ক্লাসে। আমার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাক।'

'তবেই হয়েছে। দেখুন তো এই হাত কি সেতার বাজাবার?'

হাতখানা রঞ্জনের সামনে মেলে ধরেছিলেন ইন্দ্রাণী। অপূর্ব সুন্দর করপল্লব। যেমন হাত তেমনি গড়ন। চাঁপার কলি বড় সেকেলে তুলনা। একটু অতিরঞ্জিত হলেও তাই বলতে ইচ্ছা করে। আশ্চর্য, দিনের পর দিন অফিসের কাজ করে, হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিফোনের রিসিভার ধরে, কি পাতার পর পাতা টাইপ করে—রঞ্জন জানে না ওঁকে অফিসে ঠিক কি কাজ করতে হয়, কোনদিন জিজ্ঞাসাও করেনি—এত সব করেও, শুধু কি তাই বাড়ির শত কাজও কি ওঁকে করতে হয় না? এত কাজ করেও আঙুলগুলির সৌন্দর্য ইন্দ্রাণী কী করে রক্ষা করতে পেরেছেন কে জানে। গড়ন আর রং ওঁর প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু সেই প্রাপ্তিটুকু রক্ষা করার বিদ্যা? তা নিশ্চয়ই ওঁকে যত্ন করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এই গান-বাজনার লাইনেও রঞ্জন অনেককে দেখেছে কেউ কেউ স্বভাবগত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যত্নের অভাবে অনুশীলনের অভাবে সেই ক্ষমতার আর বিকাশ হয় নি। ইন্দ্রাণী হয়তো সে ধরনের নন। তিনি যা পেয়েছেন তাকে সযত্নে ধরে রেখেছেন।

রঞ্জনের মনে হল ওই হাতে হয়তো সেতার বাজে না। কিন্তু অন্য কিছু বাজে। সে যন্ত্রটির নাম কি রূপবোধ? সৌন্দর্য-চেতনা, সৌন্দর্য অনুভবের যন্ত্র?

শুধু হাতখানিই বাঙ্ময় হল না ইন্দ্রাণীর, তিনি মুখেও কথা বললেন, 'আপনি আসুন। আপনি এলে আমরা সবাই কিছু পাই।'

রঞ্জন বলল, 'কী পান? কীই বা আমি আপনাদের দিতে পারি? আমি তো খালি হাতে আসি। আর আপনি কত যত্ন করেন। কত কিছু যে তৈরি করে খাওয়ান। সব নিত্য নতুন। আপনার আর্টে রিপিটেশন নেই। আপনি যে সব জিনিস তৈরী করেন আমি তাদের সব নামও জানি না। কিন্তু রূপে মুগ্ধ হই। বর্ণে গন্ধে—'

ইন্দ্রাণী হেসে বলেন, 'শুধু বর্ণ আর গন্ধ? সুর শোনেন না আমার রান্না থেকে? আপনার শুধু কথা। শুধু স্তব আর স্তুতি। কিন্তু খেতে জানেন না। দেবতাদের মত শুধু দৃষ্টিভোগ।'
দেবতাদের মত! প্রায় দেবতা করেই তুলেছেন ওঁরা রঞ্জনকে। দেব না হোক গুরুদেব। যে তক্তাপোষখানার ওপর বসে রঞ্জন ভবেশ বাবুকে সেতার শেখায় সেখানে সুন্দর একখানি আসন পেতে দেন ইন্দ্রাণী।

এটা নাকি ভবেশবাবুরই নির্দেশ। ভবেশবাবু বসেন সাদা কি নীল কি হলদে রঙের চাদরের ওপর যখন যেটা পাতা হয়। আর রঞ্জনের ভাগ্যে সেই চাদরের ওপর আরও একটু বাড়তি সমাদর জোটে। সে ওই বিচিত্র বর্ণের রমণীয় আসনখানি। আজকালকার মেয়েরা আসন বোনে না। এই আসন নাকি ভবেশবাবুর বৃদ্ধা মায়ের হাতের বোনা। তিনি পরলোকগামিনী। এ বাড়িতে এই আসনের মূল্য অনেক। রঞ্জন প্রায় প্রতিবারই আপত্তি করে, 'আবার এসব আসন-টাসন কেন ভবেশবাবু?'

'বাঃ, আপনি যখন গুরুর ভূমিকায় বসবেন, তখন আসন থাকবে না?'

'ওসব গুরু-টুরু বলবেন না ভবেশবাবু, বড় লজ্জা পাই।'

'তাহলে কি বলব? শিক্ষক? টিউটর? ভালো লাগে না শুনতে। তার চেয়ে গুরুর অর্থগৌরব অনেক বেশি। ধ্বনিমাধুর্যও আছে। দেখুন রঞ্জনবাবু, আমি পৌত্তলিক নই। ভগবান সম্বন্ধে জানি না আমি কি। হয়তো অজ্ঞেয়বাদী। তা সত্ত্বেও আমার এমন সব রিচুয়াল আছে যেগুলি পৌত্তলিকদের সঙ্গে মিলে যায়। কী করব বলুন? মেলে তো মিলুক আমি ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পারি কিন্তু রিচুয়ালগুলিকে করিনে। সব নয়। বেছে বেছে। আমার নিজের সিলেকসন রিজেকসন আছে।'

রঞ্জন অবাক হয়ে তার ছাত্রের মুখের দিকে তাকায়। হয়তো কোথাও তার নিজে কথার প্রতিধ্বনি শোনে।

ভবেশবাবু বলেন, 'তাছাড়া শ্রদ্ধারও তো কিছু অনুষঙ্গ আছে। ওই আসন সেই শ্রদ্ধার আসন। শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ। আমি তৎপর নই, সে তো আপনি আমাকে শেখাতে বসেই টের পাচ্ছেন। সংযতেন্দ্রিয়ও নই। আমার মন নানা দিকে ধাবিত। কিন্তু শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা আমি দিতে চেষ্টা করি। গুণীকে সম্মান করি।'

শুনতে শুনতে রঞ্জনের অন্য কথা মনে হয়। শ্রদ্ধা জানানো কত সহজ। শ্রদ্ধা যিনি জানান তিনি শ্রদ্ধেয়কে নিজের আদর্শ দিয়ে, অভিরুচি দিয়ে সৃষ্টি করে নেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকা বড় কঠিন। একাসনে সর্বক্ষণ বসে থাকবার মত যোগবল কি রঞ্জনের আছে? নাকি সেই যোগ-মাহাত্ম্যকে সে সব সময় স্বীকার করে?

শুধু ইন্দ্রাণী নয়, নন্দিতাও বলে 'আপনি আসুন। আপনি এলে আমিও আপনার ভালো স্টুডেন্ট হব দেখে নেবেন।'

রঞ্জন বলে, 'ছি ছি, তোমাকে শেখাবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসি মাত্র।'

নন্দিতা বলে, 'কিন্তু ভালোবাসাটাই কি সব নয়?'

বলেই একটু লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

কিন্তু তার আগেই রঞ্জন তার আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটিকে দেখে নিয়েছে।

একটি তরুণী মেয়ের মুখে ভালোবাসা শব্দটির দ্যোতনা ব্যঞ্জনা যেন সংখ্যাতীত, পরিমাণরহিত।

অপ্রস্তুতভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই যেন নন্দিতা অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। অবশ্য একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যায় না। নন্দিতা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা আপনি তো যন্ত্র-সঙ্গীতের আর্টিস্ট। যারা গলায় গান গায় তাদের কি আপনি মর্যাদা দেন?'

'নিশ্চয়ই।'

নন্দিতা হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার চোখে কে বড়? ভোকাল আর্টিস্ট না ইনস্ট্রুমেণ্টালিস্ট?

রঞ্জন একটু চিন্তা করে বলে, দুইই সমান কেউ বড় কেউ ছোট নয়। যিনি সফল, তিনি সিদ্ধ নিজের ক্ষেত্রে, তিনি অনন্য।

নন্দিতা তরল স্বরে বলে, 'বাব্বা, কি শক্ত শক্ত কথাই না বলতে পারেন আপনি! রাগ হলে কেউ কেউ যেমন হিন্দী বলে কি ইংরেজী বলে, আপনারাও তেমনি রাগসঙ্গীতের আর্টিস্টরা সংস্কৃত ছাড়া বুঝি কথা বলতে জানেন না? বলুন না কার ওপর আপনার বেশি পক্ষপাত?

দু' মাসের ব্যবধান। দু মাসেরও প্রতিদিন নয়, মাত্র আট-দশ দিনের দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়। এরই মধ্যে সেই লাজুক মেয়েটি কত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ডাকলে কাছে আসে। পাশে এসেও বসে। আরও মধুর যে না ডাকলেও আসে। আসে, কথা

বলে, হাসে। যেন বিশ্ব-বিজয়ের আনন্দ। অনায়ত্ত কোন সুরকে আয়ত্ত করার আত্মতৃপ্তি।

নন্দিতার কথার জবাবে রঞ্জনও একটু চটুল সুরে বলল, 'তোমার ওপর।'

নন্দিতার অপূর্ব ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হল। না রাগে নয়, অনুরাগেও নয়। তবে প্রায় তার কাছাকাছি।

'আমার ওপর মানে?'

রঞ্জন বলল, 'গৌরবে বহুবচন ঘনিষ্ঠতায় একবচন! আবার বহুবচনে ফিরে আসি। দুইই সমান! তবে পক্ষপাতের কথা যদি বল, বাজিয়েদের চেয়ে গাইয়েদের ওপরই আমার পক্ষপাত বেশি।'

নন্দিতা হেসে প্রতিবাদের সুরে বলল, 'মোটেই নয়। আপনি বানিয়ে বলছেন। আমি গাই বলে আর সামনে বসে আছি বলে--'

রঞ্জন বলল, 'সামনে বসে আছ বলে নয়, আড়ালে থাকলেও এই কথা বলতাম। আমরা যারা যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা করি তারা একটি বাইরের যন্ত্র হাতে করে ঘুরে বেড়াই। আর তোমরা যারা গলায় গাও, দেহই তাদের যন্ত্র। তোমাদের কৃতিত্ব আরো বেশি। সর্বাঙ্গ দিয়ে তোমরা সুরদেবতার বন্দনা কর। আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর। তুমি সেদিন গাইছিলে। এই দেহ কখনো দেবালয়ের প্রদীপ, কখনো গীত মন্দিরের সুর-ঝংকার।'

নন্দিতা রঞ্জনের দিকে তাকাল, তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদু-স্বরে বলল, 'ও তুলনা কারো কারো সঙ্গে চলে। সবাইয়ের সঙ্গে কি আর চলে?'

'কী বললে?'

নন্দিতা বলল, 'কিছু না।'

রঞ্জন চুপ করে রইল। মনে মনে উপভোগ করল ওর সুখ্যাতি-টুকু। ছেলেবেলায় অভিভাবক স্থানীয় এমন অনেকেই ছিলেন, দেখতে

সুন্দর বলেই যাঁরা তাকে পছন্দ করতেন। কারো কারো আদরের মাত্রাটা একটু বেশি ছিল। রঞ্জন তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকত। স্কুলের পরীক্ষার কোন কোন পেপারে বেশি নম্বর পেলে দু একজন হিংসুটে সহপাঠী তাকে ক্ষ্যাপাত—'মাস্টারমশাইরা কি তোর খাতা দেখে নম্বর দিয়েছেন? মুখ দেখে নম্বর দিয়েছেন। মুখে আলকাতরা মেখে আয় দেখবি তোর খাতায় পাশের নম্বরও উঠবে না।' আবার অঙ্কে কোনরকমে টেনে মেনে পাস করত বলে যতীনবাবু কী ব্যঙ্গ বিদ্রূপই না করতেন, 'বাবা, শুধু কি মাকাল ফল হয়েই থাকবে?'

কে জানে সে মাকাল ফল হয়েই আছে কিনা। কারো কারো বিচারে নিশ্চয় তাই। তার নিজের বিচারেও মাঝে মাঝে ওই রায় বেরোয়। কোথায় সেই প্রার্থিত সাফল্য? কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি?

আবার কখনো কখনো মাকাল ফলের গায়ে সে সস্নেহে আদরে হাত বুলায়। তার মনে অন্য চিন্তা আসে। জীবনে আকাঙ্ক্ষার তুলনায় প্রাপ্তি যখন এত কম তখন মাকাল ফল ভেবেও কেউ যদি তাকে কিছু দেয়, খাতায় যদি দুচার নম্বর বেশি ওঠে, ক্ষতি কি? গুণ যদি তার কিছু থাকে তা যেমন তার নিজের রূপ যদি তার কিছু থাকে তাও তেমনি। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তাকে একান্ত ভাবে অবজ্ঞা করে কেউ যদি শুধু তার দেহসৌন্দর্যের জন্যেই তাকে ভালোবাসে রঞ্জন কি তা সহ্য করতে পারবে? বলা কঠিন। বলা বড় কঠিন। কোন কোন মুহূর্তে সে-ও কি মনে মনে দেহসর্বস্ব হয়ে ওঠে না? দেহাত্মবাদী হয় না? দৈহিক প্রাপ্তিকে একমাত্র প্রাপ্তি বলে মনে করে না? দেহাভিমান ত্যাগ করা কি এতই সহজ।

রঞ্জন একটু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা সাজগোজ ভালোবাসে বলে তার সতীর্থ কমল ঘোষ, গানের ভাষায় গুরুভাই, তার পিছনে লেগেই আছে।

কমল বলে 'তুই ব্যাটা জন্ম-নার্সিসাস। মেয়েদের মত আয়নায় কেবল নিজের মুখ দেখিস। যেন তোর নিজের ছাড়া সুন্দর মুখ জগতে আর কারো নেই। তুই একটা অর্ধনারীশ্বর। এই জন্যেই তোর ঘরে বউ এল না।'

কমল অর্ধনারীশ্বর নয়, হয়তো তার মত নার্সিসাসও নয়, তবু তার ঘরেও বউ আসেনি। একই ওস্তাদের ছাত্র তারা। একই ঘরানার। যারা অমনোযোগী শ্রোতা তারা বলে তুজনে একই রকম। একই ওস্তাদের প্রোটোটাইপ। কিন্তু যাঁরা যথার্থ ই সমঝদার তাঁরা জানেন রঞ্জন তার ওস্তাদের থেকে যেমন স্বতন্ত্র, তার সতীর্থ বন্ধু কমলের থেকেও তেমনি স্বতন্ত্র। যেমন ব্যক্তি হিসাবে, তেমনি শিল্পী হিসাবে। এই ভেদাভেদ তত্ত্বেও সে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে।

বাইরের দিক থেকে কমল কত অন্য রকম। রঞ্জন মাঝে মাঝে তাই বন্ধুটির কথা ভাবে। সামনে বসিয়ে রেখেও ভাবে, আড়ালে রেখেও ভাবে। একই সঙ্গে বন্ধু আর প্রতিযোগী। রঞ্জনের মাঝে মাঝে মনে হয় কমল তার চেয়ে অনেক সুখী, সুস্থ, বস্তুবাদী আর বর্হিমুখী। অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়ন ওকে বোধহয় অত সহ্য করতে হয় না। সেদিন পর্যন্তও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ছিল কমলের কঠোরতর। সেই তুলনায় রঞ্জন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত। অল্পবয়সে ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে নিয়েছে। আজও সে দায়ভার থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। যতদূর মনে হয় সেই জন্যেই কমল বিয়ে করেনি। সামাজিক বিচারে কমলের স্বার্থত্যাগ আরও বড়, মানুষ হিসাবে সে আরও মহৎ। রঞ্জনের এমন কোন দায়দায়িত্ব ছিল না। অনেকেরই ধারণা, বিয়ে না করাটা তার একটা খেয়াল মাত্র। কেউ কেউ হয়তো একথাও ভাবে রঞ্জন বিবাহ-বন্ধনের বাইরে থেকে বিবাহিত জীবনের সুখটুকু চায়। পায়ও। সে দায়িত্বহীন কাপুরুষ। রঞ্জন মনে মনে হাসে। অবিবাহিত থাকার এই এক সুবিধা।

অনেকেই তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়। কারো কারো বা এমন মাথা ধরে যে শত অ্যাসপ্রো-অ্যাসপ্রিনেও তা সারে না।

কেন বিয়ে করল না? এ প্রশ্নের সদুত্তর রঞ্জন নিজেই কি আজ দিতে পারে? প্রশ্নপত্রের এই প্রশ্নটিকে সে আজকাল এড়িয়েই চলে। স্রেফ অমিট করে যায়। জীবনে আরো অনেক প্রশ্ন আছে। বিরাট প্রশ্নের অন্ত নেই। সেগুলির জবাব দিতে দিতেই প্রাণান্ত।

তবু কমলকে রঞ্জন মাঝে মাঝে ঈর্ষা করে বইকি। শিল্পী হিসাবে ওর গুণবত্তাকে ঈর্ষা করে না। ঈর্ষা করে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে। রঞ্জনও ওর মত বাইরে আসতে চায়। অন্তরের অন্ধকার রুদ্ধ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে বহির্জগতে ব্যক্ত হতে চায়।

ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আইডেনটিটি বদল করতে পারলে যেন ভাল হয়। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও করতে পারে কি? এ সাধ নিতান্তই শখের সাধ। এর মধ্যে সাধনার কিছুমাত্র উদ্যম নেই তাও রঞ্জন জানে। আত্মপ্রীতি মানুষের আমৃত্যু সঙ্গী। সেই প্রীতির এক কণাও সে ছাড়তে চায় না। রূপবান না হোক, গুণবান না হোক, প্রতিটি ব্যক্তিই নার্সিসাস। বোধহয় এই অর্থেই নিঃস্ব যে স্বত্ববান সে-ও রাজা।

কমল নতুন করে তার পিছনে লাগতে শুরু করেছে। সপ্তাহে একদিন করে ওর সঙ্গে দেখা হয়। রঞ্জন যেমন সপ্তাহে একদিন করে তার ছাত্র ভবেশবাবুর বাড়িতে আসে, তেমনি একদিন করে যায় ওস্তাদের বাড়ি। গুরুবারটি তার গুরুগৃহের জন্যে। কমল আসে দক্ষিণ কলকাতা থেকে। আরো কেউ কেউ আসেন। তবে এই সাপ্তাহিক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী-সম্মেলনে আর সবাই তেমন নিয়মিত নন। রঞ্জন আর কমল যেন বুদ্ধদেবের সারিপুত্ত মৌদ্গলায়ন—দুই শিষ্য।

ওস্তাদ তাদের এই আনুগত্যে খুশি হন। এখন আর হাতে-

কলমে তাদের শেখান না। তবু যতক্ষণ তারা থাকে গানবাজনার আলোচনাই চলে। আবার কোন দিন অন্য প্রসঙ্গও ওঠে। যেমন, গোলাপ ফুল লাগানোর গল্প। ওস্তাদের পুষ্পবিলাস আছে। নিজের হাতে বাড়ির ছাদে ফুলের চাষ করেন। যেমন, মাছ ধরার গল্প। ওস্তাদ যেমন নিপুণ সেতারী, তেমনি দক্ষ মৎস্যশিকারী। পাখি শিকারেও তাঁর বন্দুক অব্যর্থ। ওস্তাদ খাইয়ে মানুষ। ভোজনপ্রিয়, ভোজনপটু। খাওয়া দাওয়ার গল্পও কম হয় না। কেবল গল্প নয়, ওস্তাদের স্ত্রী বাস্তব ব্যবস্থাও করেন।

ওস্তাদ বলেন, 'গানা আর খানা। না খেলে কি আর গান হয় ?'

রঞ্জন মনে মনে স্বীকার করে, হ্যাঁ একেই বলে জীবনরসিক। স্থূল সূক্ষ্ম জীবনের সর্বস্তর থেকে আনন্দ আহরণ করতে হবে, রস আহরণ করতে হবে। তুমি যদি আহরণ করতে না পার, বিতরণ করবে কী করে ? তুমি যদি গ্রহণ করতে না পার, তোমার দানের ভাণ্ডার কী করে বার বার ভরে উঠবে ?

কিন্তু এসব শুধু তত্ত্ব। বাস্তবক্ষেত্রে রঞ্জন যা তাই থাকে। নিজের প্রকৃতি প্রবণতা, অর্জিত কয়েকটি অভ্যাস দোষগুণ মুদ্রাদোষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই সীমার বাইরে এক পা বাড়াবারও যেন তার সাধ্য নেই। যদিও সীমা ভাঙবার আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন।

রঞ্জন পারে না, কমল কিন্তু পারে। সে ওস্তাদের পুষ্পবিলাসে মৎস্যশিকারে বিশ্বস্ত সঙ্গী।

ওস্তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেদিন রাত্রে রঞ্জন কমলকে বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছিল।

কমল হঠাৎ বলল, 'আরে তুই নাকি একটা মজার টিউশনি পেয়েছিস ?'

রঞ্জন বলল, 'মজা! মজা আবার কিসের ? কে বলল তোকে ?'

কমল বলল, 'গত মঙ্গলবার সেদিন তোদের বাড়িতে হঠাৎ এসে

পড়েছিলাম। দেখলাম তুই নেই। তোর বউদিরা চা-টা খাওয়াল। ভাগ্যে মাংস-পরোটাও জুটেছিল। সেই সঙ্গে চাটনিও পেলাম।'

'কিসের চাটনি ?'

কমল বলল, 'কুলের চাটনি নয়, আনারসের চাটনি নয়, তার চেয়েও ঢের সরেস তোর ওই টিউশনির চাটনি। তুই নাকি সেখানে সর্ববিদ্যায় বিশারদ ? বাড়ির কর্তাকে সেতার শেখাস, গিন্নীকে সাহিত্য, মেয়েকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ? অনেক টাকা কামাচ্ছিস তাহলে ? পার সাবজেক্ট শ'খানেক করে দেয় নাকি ?'

কমল বর্বরের মত রসিকতা করে।

রঞ্জন বলল, 'তার চেয়ে ঢের বেশি। ভদ্রমহিলা চমৎকার রান্না করে আর যা খাওয়ান—'

'তাই বল, খাওয়ার লোভে ওখানে পড়ে আছিস। কিন্তু তুই খেতে পারিসনে। পেটরোগা মানুষ। আহারে জন্মের অরুচি। নিয়ে চল একদিন আমাকে। খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দিই।'

রঞ্জন বলল, 'যাব একদিন নিয়ে।'

কমল হাসল, 'তুই কি আর প্রাণে ধরে নিয়ে যেতে পারবি ? মূর্তিমান স্বার্থপর।'

কথাটা পুরোপুরি অসত্য নয়। ভবেশবাবুর বাড়িতে শুধু সেতার শেখানো রঞ্জনের একমাত্র কাজ নয়। ভবেশবাবুর বাজানোর চেয়ে গান-বাজনার তত্ত্বের দিকে ঝোঁক বেশী। অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে প্রায়ই তিনি সেতার আর হাতে নিতে চান না। কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গ-সান্নিধ্যটুকু চান। আলাপ-আলোচনা ভালোবাসেন। সঙ্গীততত্ত্ব থেকে শুরু করে জীবনের নানা তত্ত্বে সেই আলাপচারিতা চলে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি। ভবেশবাবুর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয় রঞ্জন। কিন্তু শুধু মুগ্ধ মুখে শ্রোতা হয়েই বসে থাকে না। প্রতিটি সওয়ালের জবাব সে

দেয়। অন্তত দিতে সে চেষ্টা করে। ভবেশবাবুর মত না হোক কিছু পড়াশোনা সে-ও করেছে। কলেজ থেকে বেরোবার আগেই সে স্থির করেছিল চাকরি করবে না। করেওনি কোন দিন। যে সময়টা তার সমবয়সী আত্মীয়-বন্ধুরা দশটা-পাঁচটা কলম পিষেছে, কি এখনও পিষছে, কেউ বা সারাদিন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মগ্ন রয়েছে, সেই প্রচুর সময় গান-বাজনা করেও, গাইয়ে-বাজিয়েদের সঙ্গ করেও বহু সময় হাতে থেকেছে রঞ্জনের। সেই সময়টা সে সঙ্গী না পেয়ে ঠাকুর্দার পুরানো হোম লাইব্রেরীর বই-পত্র ঘেঁটেছে। তিনিও ছিলেন বৃত্তিতে ব্যবসায়ী, কিন্তু প্রবণতায় জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন বিভিন্ন বিদ্যার বিদ্যার্থী। অন্তত তাঁর সংগ্রহশালা দেখে তাই মনে হত রঞ্জনের। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াবার যে কৌতূহল তার সূত্র কি উত্তরাধিকার সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায়? যায় হয়তো। কিন্তু এই ঘোরাঘুরি নিতান্তই শৌখিন পর্যটকের। পূজোর ছুটিতে যারা বেড়াতে যায় সেই ভ্রমণ-বিলাসীদের শখের ভ্রমণ মাত্র। তার চেয়ে বেশী কিছু আর হয়নি। রঞ্জন নিজেই আক্ষেপ করে মরে, হায় এর চেয়ে বেশী আর হল না। কিন্তু হতে পারত। নিলে নিতে পারতাম। প্রচুর সময় ছিল নেওয়ার। প্রচুর সুযোগ ছিল দেওয়ার। কিন্তু আশানুরূপ দানে ও গ্রহণে জীবন ধন্য হল কই। রঞ্জন ভাবে, তবে কি আমরা সবাই প্রবৃত্তি প্রবণতায় শাসিত? সেই শাসনই কি আমাদের ইনার ডেসটিনি? ডেসটিনি কথাটা শুনলেই হাত-পা অবশ হয়ে আসে। গ্রহ-নক্ষত্রের শাসনের চেয়ে স্বশাসনের অহঙ্কার অভিমান অনেক ভালো। সে শাসন সুশাসন না হলেও ভালো। যা কিছু করেছি, যা কিছু হয়েছি আর তার বিপরীত দিকে যত কৃত্য আমি করিনি যত কর্তব্য আমি অবহেলা করেছি সব কিছুর জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী। 'আমার মৃত্যুর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়।' আত্মহত্যাকারীর এই স্পষ্ট স্বীকার-উক্তির মধ্যে গৌরব আছে। আছে

স্বত্বের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই আত্মাভিমানও কি বার বার খণ্ডিত হয় না? আমি কি স্বয়ম্ভু? আমার উৎপত্তি হ্রাস-বৃদ্ধি বিনাশ কি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর? দৃশ্য-অদৃশ্য আরো পাঁচ হাতের ছাপ কি আমার ওপর নেই? রঞ্জনের চিত্ত সংশয়-পীড়িত হয়। এই সংশয় থেকে মুক্তি নেই সে তা জানে। তবু মূলত আমিই আমার জন্যে দায়ী বলে নিন্দের বোঝা সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এইটুকুই তার আত্মপ্রসাদ।

একদিন সে ভবেশবাবুকে বলল, 'এবার আমাকে ছুটি দিন।'

ভবেশবাবু হাসলেন, 'কেন?'

যাতে তিনি আহত না হন সেদিকে লক্ষ্য রেখে রঞ্জন হেসে মিষ্টি করে বলল, 'যে জন্যে আসা তা তো তেমন হচ্ছে না।'

ভবেশবাবুও হাসলেন, 'মানে ফেল-করা ছাত্রকে আপনি একেবারে স্কুল থেকে বের করে দিতে চান? দণ্ডটা বড় কঠিন হয়ে যাচ্ছে না কি?'

নন্দিতা বলল, 'উনি কেন আসবেন বাবা? তুমি কিচ্ছু মন দিয়ে শিখবে না, রেয়াজও করবে না। শুধু তোমার বক্তৃতা শোনার জন্যে ওঁকে ডেকে আনবে। ওঁ কি অন্য কোন কাজ নেই?'

ভবেশবাবু বললেন, 'আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি এবার থেকে আমি ভাল ছাত্র হব।'

এমন কথা ভবেশবাবু অনেকবার দিয়েছেন, কিন্তু রাখতে পারেননি। কিন্তু রঞ্জনের অন্যমনস্ক শৌখিন ছাত্র কি শুধু ভবেশবাবু একাই? শাস্তি দিতে হলে তো আরো অনেককেই দিতে হয়। রঞ্জন জানে তার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই ক্ষণস্থায়ী। ছাত্রীরা বিয়ের পরে আসা ছেড়ে দেয়। ছাত্রদের মধ্যেও অস্থিরচিত্তের সংখ্যাই বেশি। নানা কারণে তারা টিঁকে থাকতে পারে না। কেউ বা সংসারের চাপ বেশি পড়েছে বলে ছেড়ে দেয়। কারো বা পদোন্নতি

হয়ে অফিসের চাপ বাড়ে। কেউ বা বদলী হয়ে অন্য কোথাও চলে যায়। সঙ্গীতের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক'জন আর করতে পারে? রঞ্জনের ওস্তাদের দু'জন অন্তত এমন ছাত্র আছে যারা তাঁকে জীবনস্বত্ব লিখে দিয়েছে। রঞ্জন কি তেমন একজনকেও পাবে?

ভবেশবাবু এবারও তাকে ধরে রাখলেন। হেসে বললেন, 'রঞ্জনবাবু, সেতার আপনার লক্ষ্য, আমার কাছে না হয় উপলক্ষ হয়েই থাকুক। তবু আপনি আসুন। একটু ক্ষতি স্বীকার করেও আসুন। আমারও সঙ্গী নেই, সাথী নেই। এই বয়সে কথা বলার বন্ধুই তো পরম বন্ধু। বাগদান ও বাক্যগ্রহণ। আজকালকার দিনে ভাবের সম্পর্কের বড় অভাব। আমাদের কারো কাছে কারো কোন প্রত্যাশা থাকবে না। তবু একজন আর একজনের আশাপথ চেয়ে থাকব— ভাবতেও ভাল লাগে।'

রঞ্জন নিজেও কি বন্ধুত্ব কামনা করে না? সে-ও কি সন্ধান করে না meaningful relationship-এর? কিন্তু কিসে গড়ে ওঠে সেই সার্থক সম্পৃক্ততা? রঞ্জন নিশ্চিত জবাব দিতে পারে না। কোন কোন মুহূর্তে মনে হয় তার বন্ধুর সংখ্যা অগণিত। আবার কখনো কখনো মনে হয় যাদের সে বন্ধু বলে ভাবত তার পরিচিতের দলভুক্ত মাত্র। এই দলও তার ছাত্রছাত্রীদের দলের মত। আসে আর যায়। তার বহু বন্ধু বিগত দিনের স্মৃতিমাত্র। কারো কারো সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তাদের আর চেনা যায় না। আকার হয়তো তেমন বদলায়নি, কিন্তু প্রকার একেবারে বদলে গেছে। কেউ বিত্তশালী হয়েছে, কেউ প্রতিপত্তি-শালী। এখনকার দিনে বিত্ত আর প্রতিপত্তি সমার্থক। যারা অত উচ্চস্তরে ওঠেনি তাদেরও উৎসাহ এমন সব দিকে চলে গেছে রঞ্জন তাদের ধারে-কাছেও কোনদিন যেতে পারবে না।

যে বৃহৎ পরিবারের মধ্যে রঞ্জন বাস করে তার প্রতিটি সম্পর্ক স্থায়ী সম্পর্ক। কিন্তু কোন কোন সময় মনে হয় এই সম্পর্কগুলি যেন ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখা বহুদিনের গহনা। কিংবা দাদাদের ফিক্সড্ ডিপোজিটের টাকা আছে এই চেতনাটুকুতেই আনন্দ। অবশ্য বাড়িতে কারো সঙ্গেই তার কোন অসৌহার্দ্য নেই। তবু কি মন সৌহার্দ্যের বিস্তার চায় না? নতুন ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হলে আরো আনন্দ হয় না?

কোথায় সেই বন্ধন যার মধ্যে মুক্তির স্বাদ আছে? সহস্র বন্ধন তো ভালো, রঞ্জন একটি বন্ধন সুখও তো কোথাও খুঁজে পেল না।

রঞ্জনের ওস্তাদ এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কমলের মুখেও এসব ভাবনার কথা সে কখনো শোনেনি: কমল ওস্তাদের আশীর্বাদ-ধন্য। আর ওস্তাদ আশীর্বাদ-ধন্য তাঁর খোদাতাল্লার। রঞ্জনের কে আছে?

ভবেশবাবুর ভাবের সম্পর্কও কি প্রশ্নাতীত? এ ধরনের সম্পর্কও কি অর্কিডের ফুল নয়? রঞ্জনের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। অবশ্য বন্ধুত্বের পরীক্ষার জন্যে সব সময় যে দুর্ভিক্ষ আর রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে হবে কি রাজদ্বারে বা শ্মশানে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে তার কোন অর্থ নেই। কিন্তু প্রয়োজনকে কি একেবারে অস্বীকার করা যায়? অথচ বিশুদ্ধ সঙ্গীত আর অপ্রয়োজনের আনন্দে রঞ্জনের স্থায়ী বিশ্বাস।

সেদিন গিয়ে দেখল তার ছাত্র বন্ধুটি পলাতক। ইন্দ্রাণী তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে ডেকে এনেছেন। সেই একই ড্রয়িংরুম। আজকালকার থিয়েটারে যেমন একটি সেটেই অনেক সময় পুরো নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায় এও যেন তেমনি মাসের পর মাস এই একই ঘরে এসে রঞ্জন বসেছে, ভবেশবাবুকে সেতার শিখিয়েছে, কি সেতারের বিকল্পে গল্প আর আলাপ আলোচনা হয়েছে। কোন কোন দিন নন্দিতার গান শুনেছে, রহস্যালাপ করেছে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে।

একই সেটে বসে। বাইরের দিক থেকে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্তরের দিক থেকে? এই পরিবারটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যে বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে সে একটি প্রীতির সম্পর্কে এই পরিবারের চার জনের সঙ্গে আবদ্ধ। চারজন না তিনজন? সেই উচ্চাভিলাষী নৌবিদ্যা শিক্ষার্থী সমুদ্রের স্বপ্নে বিভোর জয়ন্তকে সে বড় একটা কাছে পায় নি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পায়নি। সে হোস্টেলে থেকে পড়ে। ছুটিছাটায় যখন বাড়িতে আসে তখনও বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তার জগৎ আলাদা। রঞ্জনের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ওই তরুণদের দলে গিয়ে ঢুকে পড়তে। তারুণ্যের স্পর্শ পেতে। ইচ্ছা করে ওর মনের কথা জানতে। ওর যে সব বিষয়ে উৎসাহ সেগুলির পরিচয় নিতে।

ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারিংএর কিছু বই একদিন ওর কাছে চেয়েছিল রঞ্জন।

জয়ন্ত বলেছিল, 'আপনি কি ওসব বুঝতে পারবেন? বই পড়ে দরকার কি। সমুদ্রে যখন যাব আপনাকে নিয়ে যাব। সে কথা আমার মনে আছে।'

রঞ্জন ভাবে মনে যে আছে এইটুকুই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হলে জয়ন্ত যে হেসে সৌহার্দ্যের স্বীকৃতি জানায় সেইটুকুই যথেষ্ট। পৃথিবীর সব মানুষের ওপর রঞ্জন কি সমান আকৃষ্ট হয় যে সে আশা করবে সবাইকে সে সমভাবে আকর্ষণ করতে পারবে?

সোফার মাঝখানটিতে বসে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ছাত্রটি কোথায়? অফিস থেকে ফেরেননি বুঝি?'

ইন্দ্রাণী মৃদু হেসে বলল, 'ফিরেছেন। আপনার ছাত্র আজ মাস্টার মশাইয়ের বকুনির ভয়ে পালিয়েছেন।'

রঞ্জন বলল, 'মাস্টারমশাইয়ের বকুনির ভয়ে না গৃহকর্ত্রীর বকুনির ভয়ে?'

ইন্দ্রাণী এবার ব্যাপারটা খুলে বললেন, একটা জরুরী বৈষয়িক কাজে ভবেশবাবুকে তাঁর বর্ধমানের গাঁয়ের বাড়িতে হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে। অফিস থেকে ফোন করে রঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন, কানেকসন পাননি। ইন্দ্রাণীর ওপর ভার ছিল খবর দেওয়ার।

রঞ্জন বলল, 'দিলেন না কেন ?'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'ইচ্ছে করেই দিইনি। দিলে তো আপনি আর আসতেন না।'

রঞ্জন বলল, 'বাঃ রে আপনি যখনই ডেকে পাঠিয়েছেন আমি এসে হাজির হয়েছি। এই তো সেদিন আপনার মেয়ের জন্মদিনে এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেলাম। বিনা উপলক্ষেও এসেছি। না ডাকলেও এসেছি।'

ইন্দ্রাণী উল্টোদিকের আসনে বসেছিলেন, কৌতুকোজ্জ্বল চোখে রঞ্জনের দিকে তাকালেন। স্মিতমুখে বললেন, 'সেইটাইতো বন্ধুর কাজ। কিন্তু জেনে রাখবেন আপনি কোনদিনই এখানে না ডাকতে আসেননি। কোনদিনই অনাহুত হননি। আপনার জন্যে ডাকাটা এখানে লেগেই আছে। যাকে বলে স্থায়ী আমন্ত্রণলিপি।'

রঞ্জন চুপ করে রইল। ঘরে আর কেউ নেই। একটি সুন্দরী সুশিক্ষিতা বাকনিপুণা মহিলা প্রসন্ন প্রীতি আর বন্ধুত্বের দাক্ষিণ্য তার দিকে মেলে ধরেছেন। মাঝখানে একটি সীমারেখা নিশ্চয়ই আছে। সঙ্গতি শোভনতা সামঞ্জস্যের সীমা। এই সম্পর্ককে কী বলবে রঞ্জন ? গভীর না অগভীর ? অর্থহীন না অর্থপূর্ণ ? রঞ্জন জানে ইন্দ্রাণী শুধু ফ্লার্ট করতেই ভালোবাসেন না সেবা যত্নেও ওঁর আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। সেই আদর যেন স্পর্শগ্রাহ্য। হাত দিয়ে তাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, হাতের মুঠি ভরে তোলা যায়।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ বললেন 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবেন ?'

রঞ্জন বলল, 'বলুন না। ক্ষমতা থাকলে দেব।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'ক্ষমতা আপনার আছে। কিন্তু আপনি তা খাটান না।'

রঞ্জনের মনে হল একথা তার সঙ্গীতের সম্বন্ধে নির্মম সত্য! এজন্যে ওস্তাদের কাছে এখনো সে মাঝে মাঝে তিরস্কৃত হয়, যে সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল তা পূর্ণ হল না। কিসের বাধা কোথায় বাধা? প্রতিকূলতা কি শুধু বাইরের? না ভিতরেরও।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আপনি আপনার নিজের সম্বন্ধে কখনো কিছু বলেন না। যেটুকু দেখতে দেন আমরা সেইটুকুই দেখি। যেটুকু শুনতে দেন শুধু সেইটুকুই শুনি।'

রঞ্জন কোন প্রতিবাদ করল না। হাসিমুখে চুপ করে রইল। ভাবল ওঁরাও কি তাই করেন না? ওঁদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা এত অন্তরঙ্গতা কিন্তু ওঁরা ওঁদের নেপথ্য জীবনের কতটুকু রঞ্জনকে জানতে দিয়েছেন? প্রায় কিছুই না। ওঁদের সাংসারিক জীবনের কথা রঞ্জন জানে না, জীবনে কোন গভীর সমস্যা আছে কিনা রঞ্জন তার কোন খোঁজ রাখে না। কারণ ওঁরা কোন সন্ধান দেননি। ওঁদের কোন রকম চিন্তা-ভাবনার কথা তার কাছে অজ্ঞাত। এরই নাম আধুনিক নাগরিকতা। যে যার প্রাইভেসি রক্ষা করে চলে। রঞ্জনের মাঝে মাঝে মনে হয় এই কয়েকটি চরিত্র যেন চিত্রাপিত মূর্তি। ছবিতে যা আঁকা আছে তাই সমগ্র জীবন। কিন্তু তাতো নয়, সেই ছবি জীবনের যৎসামান্য প্রতীক মাত্র। তবু মহৎ শিল্পী সেই প্রতীকী চিত্রে সমগ্র জীবনকেই যেন ধরে দেন। কোন শিল্পপ্রেমিক জিজ্ঞাসা করে না আপনার ওই মূর্তিটি কী খায়, কী পরে, কী ভাবে, কী চিন্তা করে? আপনি যেটুকু দেখিয়েছেন তার আড়ালে কী আছে, বাইরে কী আছে কেউ জিজ্ঞাসা করে না।

কিন্তু বাস্তব জীবনের বেলায় আমাদের দাবি অনেক বেশি।

কৌতূহলের শেষ নেই। রঞ্জন ভাবে এই কৌতূহল দমন করার নামই নাগরিক সভ্যতা।

আশ্চর্য, খুব একটা কৌতূহল যেন তার নেইও। তেমন কোন গভীরতা জটিলতার মধ্যে রঞ্জনই কি যেতে চায়? চায় না। কোন কিছুর মধ্যে ইনভল্‌ভড্‌ হয়ে পড়তে চায়? চায় না। অথচ মাঝে মাঝে জয়ন্তের সেই সমুদ্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। সমুদ্রের স্বাদ পাওয়ার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। যে সমুদ্র উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গোচ্ছ্বসিত। সেই সমুদ্রকে সে জীবনে বহুবার বহু জায়গা থেকে দেখেছে। কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি, সাঁতার কাটতে পারেনি। সমুদ্রস্নানে তার ভীষণ ভয়। তাই তার জন্যে রয়েছে আর্টিস্টের আঁকা সমুদ্র। তরঙ্গিত সিন্ধু। কিন্তু কোনদিন তা ডুবিয়ে মারে না। শুধু মগ্নতার অনুভূতি জাগায় মাত্র।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আপনি কী ভাবছেন বলুন তো?'

রঞ্জন বলল, 'কিছু না, আমি শুধু দেখছিলাম।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'হুঁ, দেখছিলেন না আরো কিছু! যেন আপনারই দুটি চোখ আছে আর কারো যেন চোখ নেই। আপনি দেখতে ভালোবাসেন না। শুধু শুনতে ভালোবাসেন।'

রঞ্জন মনে মনে বলল, 'তাই যদি হত। আহা তাই যদি হত।' বিল্বমঙ্গলের মত সেও কি নিজেকে বার বার বলে না, 'চেয়ে দেখ মন কত তোরে নাচায় নয়ন।' কিংবা সুরদাসের মত প্রার্থনা করে নি, 'লও বিঁধে দাও বাসনা সঘন এ কালো নয়ন মম।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের বাড়িভরা তো অত লোক। আপনি কাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন বলুন তো?'

'কী করে বলব। নিক্তিতে তো ওজন করে দেখিনি।'

'আহা নিক্তিতে ওজন করতে হয় বুঝি? নিজের মনে টের পাওয়া যায় না? আচ্ছা, নিজেদের বাড়ীর কথা না হয় নাই বললেন।

আমাদের বাড়িতে তো মাত্র চারজন। আমাদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে কাকে ভালোবাসেন বলুন তো?'

রঞ্জন হেসে বলল, 'বলতে পারব না।'

ইন্দ্রাণী সকৌতুকে বললেন, 'আমি কিন্তু বলতে পারি। তারপর হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিনি এবার এঘরে আয়। বোস এসে এখানে। ঢের সেলাই করেছিস এবার আয় বাপু। আমি ওঁর জন্যে একটু খাবার টাবার এনে দিই।'

ইন্দ্রাণী চলে গেলেন। নন্দিতা এসে ঘরে ঢুকল। এমব্রয়ডারির কাজটা ওর হাতেই আছে। মুখখানা একটু যেন গম্ভীর। কিছুদিন ধরে কী যে হয়েছে মেয়েটির কে জানে? ভবেশবাবুর মুখে হাসিটি যেমন লেগেই আছে, ইন্দ্রাণীর মুখে স্মিতহাসির দাক্ষিণ্য যেমন লেগেই রয়েছে, নন্দিতার মুখখানি কিন্তু ইদানীং তেমন দেখা যায় না। সে মুখে ছায়া-আলোকের খেলা চলে। চলে বলেই রঞ্জনের কাছে ওই মুখ আরো বেশী জীবন্ত আর রহস্যময় মনে হয়। কোন কোন সময় ওর মেজাজে একটু যেন রুক্ষতার আভাস ফুটে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে সংযত করে নেয়। তেমন কোন অসৌজন্য যে প্রকাশ পায় তা নয়। তেমন কোন অসৌহার্দ্যও নয়। দুতিন মিনিট কথা বলবার পরই ওকে আবার সেই প্রছন্নতার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে রঞ্জন। তবু ওর মাঝে মাঝে ভাবান্তরটা লক্ষ্য না করে পারে না। মনে মনে ভাবে এই তরুণীর চিত্তাকাশে কখন যে কোন হাওয়া বয় কে বলবে? ও নিজেই কি তা বলতে পারে?

নন্দিতা এসে তার ঠিক মায়ের জায়গাটিতেই বসল।

রঞ্জন বলল, 'আজ বুঝি গানবাজনা হবে না?'

নন্দিতা বলল, 'না। দেখছেন না গলার অবস্থা? এই গলায় গান হয়? আপনারা বেশ আছেন। সেতারের গলা খারাপ হবার ভয় নেই।'

রঞ্জন বলল, যন্ত্রেরও যন্ত্রণা আছে। হঠাৎ হয়তো তারটা ছিঁড়ে গেল। কি আরো ছোটখাটো দুর্ঘটনা। কিন্তু ইদানীং গলা ভাল থাকলেও দেখছি গানে যেন তোমার আর তেমন উৎসাহ নেই। অনুরোধ উপরোধ করলে তবে গাইতে বসো।'

নন্দিতা বলল, 'কী করব বলুন তো। মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। এদিকে পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। অথচ কোর্স শেষ হয়নি। ডেট অ্যানাউনস্‌ড হবার পর কতবার যে পিছোবে তারও ঠিক নেই। সবই অনিশ্চিত। এদিকে আবার সেলাইয়ের পরীক্ষাতেও বসতে হবে। ফলে গানটা বাদ যাচ্ছে।'

এই মেয়েটির সমস্যা এখন বালিকার খেলাঘরের সমস্যার মত মনে হয় রঞ্জনের। কতদূরে ফেলে এসেছে সে নিজের ছাত্রজীবন। পরীক্ষা আর তার প্রস্তুতিপর্ব। তবু পরীক্ষার কি শেষ হয়েছে? সে পরীক্ষা নিজের কাছে নিজের। কদাচিৎ রঞ্জন তাতে পাস-মার্ক পায়।

রঞ্জন বলল, 'তুমি অতগুলি পরীক্ষার দায়িত্ব এক সাথে নিলে কেন? একটা একটা করে দাও না।'

নন্দিতা একটু হাসল, 'একসঙ্গে ঘাড়ের ওপর সব এসে পড়লে কী করব। মাঝে মাঝে ভাবি গানটা ছেড়ে দেব।'

রঞ্জন যেন একটু আহত হয়। 'কেন ছাড়বে। তোমার গলা অত মিষ্টি।'

একটু বাদে হেসে বলল, অবশ্য দেখে-শুনে মনে হয় সেলাইয়ের দিকে তোমার ঝোঁক বেশী। বোধহয় নৈপুণ্যও বেশি। সেদিন তোমার হাতের কাজ দেখছিলাম। তুমি আর তোমার মা আমাকে দেখিয়েছিলে।'

'ভালো লেগেছিল আপনার?'

রঞ্জন বলল, 'নিশ্চয়ই।'

তারপর ইন্দ্রাণী যেমন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তেমনি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তুমি কী বেশি ভালোবাসো বল তো? গান না সেলাই? কোনটা তোমার first love?'

নন্দিতা একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল। একটু বাদে সহজ সপ্রতিভ মুখ তুলে একটু হেসে বলল, 'ফার্স্ট সেকেণ্ড জানিনে দুটোই ভাল লাগে। তবে মাঝে মাঝে কোন একটা আমাকে পেয়ে বসে। যখন সেলাই করতে ভালো লাগে তখন আর তা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। মা-র কাছে তো বকুনি খাই। মা বলেন তোর চোখ দুটো যাবে। শিগগিরই তোকে চশমা নিতে হল বলে। নেশার মত পেয়ে বসে। কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করে না। একেকটা স্টিচে যে কী আনন্দ!'

রঞ্জন আস্তে আস্তে বলল, 'আমারও আছে মিউজিকের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী। আমারও আছে ওই রকম একটি সেলাইয়ের নেশা।'

'সেলাইয়ের নেশা?' হঠাৎ নন্দিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। ওর অত উচ্চ হাসি এর আগে কখনো শোনেনি রঞ্জন। হাসলে সবাইকেই সুন্দর দেখায়। নন্দিতাকে যেন আরো সুন্দর দেখাল। শুধু দেখল না, কান পেতে সেই কণ্ঠস্বর শুনল রঞ্জন। এই ধ্বনিকে কোন রাগিণীতে বাঁধা যায়? তুলে নেওয়া যায় কি সেতারের তারে।

হাসি থামিয়ে নন্দিতা বলল, 'আর বলবেন না। সেলাই সম্বন্ধে আপনার কোন আইডিয়াই নেই। আমি তা বুঝে নিয়েছি। আপনার আবার সেলাইয়ের নেশা! সূঁচে একগাছি সুতো পরাতে পারবেন আপনি?'

রঞ্জন বলল, 'আমারও একটা সেলাইর নেশা আছে। আমার মিউজিকের শত্রু। সেই এমব্রয়ডারির নাম raw life. জীবনতৃষ্ণা। আমার ভারি ভালো লাগে সম্পর্কের সূঁচে সুতো পরিয়ে একটি একটি

করে ডিজাইন ফুটিয়ে তুলতে। সেই নেশায় আমার মিউজিক স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন কোন সময় মরার মত পড়ে থাকে।'

নন্দিতা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল। রঞ্জন জানে নন্দিতার ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ে যে সব সমস্যা তা যেমন রঞ্জন এখন আর বুঝতে পারে না, রঞ্জনের সমস্যাগুলিও তেমনিনন্দিতার কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু সামনের ওই নারীমূর্তিটি উপলক্ষ মাত্র। রঞ্জন যেমন কখনো কখনো শুধু নিজের জন্যেই বাজায়, শুধু নিজেকে শোনায়, আত্মগত ভাবে কথাগুলি তেমনি নিজের কাছে নিজে বলে যেতে লাগল।

আমি যখন সামাজিক জীবনে প্রবল ভাবে বাঁচি ব্যাপক সামাজিক জীবন নয়, একটি কি দুটি সম্পর্কের মধ্যে তীব্রভাবে বেঁচে থাকতে চাই, তখন আমার সঙ্গীত মরে থাকে। সেতারের তারগুলিতে ধূলো জমে। আমি বলি জমুক জমুক। এই সঙ্গীত কি আমাকে মৃত্যুর পর অমরতা দেবে ? তবে কেন আমি বেঁচে থাকতেও মরে থাকব ? কেন জীবনের সমস্ত ভোগ সুখ সম্পদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখব ?

নন্দিতা অস্ফুট স্বরে বলল, কিন্তু জীবনের এসব দাবি মেনেও তো—'

কিন্তু ওর কথাগুলি রঞ্জনের যেন কানেই গেল না। সে নিজের ঝোঁকে বলতে লাগল, 'তখন আমার মনে হয় চাই না আমি বিশুদ্ধ সঙ্গীত। চাই না জীবনের শুদ্ধতা। আমি জীবনের খাদে নামব। যেখানে মিশ্র অমিশ্র সব রকমের মেটাল আছে। সেই জীবনই তো বাস্তব জীবন। শুধু বাস্তব নয়, একমাত্র। মিউজিক তার অতি দান হীন বিকল্প।'

রঞ্জন একটু থামল। তারপর দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'কিন্তু আশ্চর্য সেই জীবনেও আমি বেশিক্ষণ আটকে থাকতে পারিনে।

ফিরে আসি আমার গানের ঘরে। মনে হয় এই তো বিশ্বজগৎ। তুলে নিই ফের যন্ত্রটিকে। তখন মনে হয়, অমরতা মৃত্যুর পরে নয়। অমরতা এই জীবনেই। অমরতা লোকের মুখে মুখে নয়, রাস্তার মোড়ে কি পার্কে বসিয়ে রাখা স্ট্যাচুর মধ্যে নয় এমনকি সিদ্ধিলাভের মধ্যেও নয়। অমরতা সাধনার মধ্যে। সাধনা খুব বড় কথা হল। অনুশীলনের মধ্যে, আমাদের গানের ভাষায়, রেয়াজের মধ্যে।'

নন্দিতা একটু হেসে বলল, 'তাই বলুন।'

এতক্ষণ যেন একটি ভূতে পাওয়া মানুষ কথা বলছিল। এবার নন্দিতা তাদের পরিচিত অতিথিকে চিনতে পেরেছে।

রঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ সেই রেয়াজের তন্ময়তায় আমি অনুভব করি, we are great in our great moments. We feel we are greater than we know. কিন্তু মুহূর্তগুলি নিতান্তই মুহূর্তমাত্র। বড় ক্ষণিক এই আত্মপ্রসাদ। বড়ই অনিত্য।'

নন্দিতা বলল, 'আমি অতশত বুঝিনে। সামাজিক জীবনকে আপনার মিউজিক থেকে কেন আপনি এমন আলাদা করে দেখছেন? কেন ভাবছেন একটা আর একটার শত্রু। আমি যখন আমার কোন বন্ধুর চিঠি পাই তখন আমার রেয়াজ করতে ভাল লাগে, সেলাই করতে ভাল লাগে। এমন যে আমার স্পেশাল পেপার ইনটারন্যাশনাল রিলেশনস যা নিয়ে আমি ভুল করেছি তা পড়তেও ভাল লাগে।'

বন্ধু। নন্দিতার হাতের সূঁচটা যেন রঞ্জনের নিজের আঙুলে ফুটে গেল। একটু আগে গ্রেটনেসের গর্ব করছিল সে। কিন্তু এখন? অবশ্য হাস্যকর এই ঈর্ষাটুকুও মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হল না। রঞ্জন সকৌতুকে ভাবল কি রকম বন্ধু? মেয়ে বন্ধু না ছেলে-বন্ধু? নিশ্চয়ই ছেলে-বন্ধু। এতদিন কোন বন্ধুবান্ধবের প্রসঙ্গ তোলেনি নন্দিতা। এমন কি ওর সহপাঠিনীকেও এ-বাড়িতে দেখতে পায়নি। ওর বাবা-মা বলেছেন আমাদের মেয়ে বড় অমিশুক অসামাজিক। বড় চাপা

স্বভাবের। ওর মনের কথা কাউকে বলে না। সব সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে।

সিন্দুক তো নয় সোনার ঝাঁপি। সেই ঝাঁপির মুখ অসাবধানে মুহূর্তের জন্যে একটুখানি মাত্র খুলে গেছে। খুলে গিয়ে আবার বন্ধও হয়েছে। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে কল্পনায় বিশ্বদর্শন করল রঞ্জন। কেমন বন্ধু? কতখানি ওদের ঘনিষ্ঠতা? কতদিনের? রঞ্জনের মনে পড়ল পার্কের লাগা লেটার বক্সটায় ওকে দু-একখানা চিঠি পোস্ট করতে দেখেছে বটে। পাড়ায় পোস্টঅফিসেও দেখা হয়েছিল দুদিন। কী যেন পার্শেল করে পাঠাচ্ছে। কী সে সব? ওর হাতের কোন এমব্রয়ডারির কাজ। আর একবার দেখা হয়েছিল শীতকালে। বেশ বড় পার্শেল হাতে। কী ছিল তার মধ্যে? সোয়েটার না কমফর্টার? ওর বন্ধু কি শীতের দেশে থাকে? নাকি চিরবসন্তের দেশে?

রঞ্জনের মনে হল সেই জন্যেই বোধহয় এমব্রয়ডারি ওর first love. ও তো এখন ওর গান রেকর্ড করায়নি, রেডিওতেও গায় না। হাতের কাজ পাঠায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূচী-শিল্প। সুরম্য চারুতা। ওর দিনের স্বপ্ন, রাতের স্বপ্ন, সোনার স্বপ্ন বুনে বুনে পাঠায়।

একরাশ খাবার নিয়ে ইন্দ্রাণী এবার ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'আর্ট অ্যাণ্ড লাইফ। দারুন দারুন সব কথা। নন্দনতত্ত্ব জীবনতত্ত্ব। সব তত্ত্বের সার কিন্তু এই ভোজনতত্ত্ব। পেটে দানা-পানি না পড়লে কিছু বেরোয় না। না গলায়, না তারযন্ত্রে।'

খাবারের বাটিগুলি সযত্নে নামিয়ে রাখলেন সেণ্টার টেবিলে। তারপর রঞ্জনের দিকে চেয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'আজ খান দেখি ভাল্ করে। আজ যেন না না না-শুনি। নীতি বাদেরও একটা সীমা আছে।'

আজ করেছেন সব ডিমের প্রিপারেশন। রাবড়ি তৈরি করেছেন

নিজের হাতে। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'মিনি আজ তুই দে তো সব হাতে করে। টিকোজিটা রাখ এবার।

নন্দিতা হেসে বলল, 'কেন মা, তুমিই তো দিচ্ছ। তোমার রান্না করা জিনিস আমি কেন দিতে যাব? খেটে মরব আমি, নাম হবে তোমার।'

ইন্দ্রাণী রঞ্জনের দিকে চেয়ে বললেন, 'শুনুন মেয়ের কথা। বেশ, তুই নিজেই তা হলে ওঁকে একদিন রেঁধে খাওয়াস। ডাল আর মাছের ঝোলটা তো কোন রকমে নামাতে পারিস। তাহলেই হবে। উনি তাই অমৃতের মত খাবেন।'

নন্দিতার মুখ কি একটু আরক্ত হয়ে উঠল? হলেও নিমেষের জন্যে। পরক্ষণে সে-ও সপ্রতিভ ভাবে বলল 'এবার শুনুন আমার মায়ের কথা। ভদ্রমহিলা কি হিংসুটে দেখেছেন?'

খেতে খেতে রঞ্জন উপভোগ করল মা-মেয়ের এই দ্বন্দ্ব কলহ। মা-মেয়ের আসল কলহও সে কখনো কখনো দেখেছে। তা যে কত ভীষণ মারাত্মক হয় তা সে জানে।

খাদ্যের পর পানীয়। কফি। কফির সময় সঙ্গিনী হলেন সকন্যা ইন্দ্রাণী। হেসে বললেন 'যাক। আজ তবু লক্ষ্মীছেলের মত কিছু খেয়েছেন।'

রঞ্জন এবার ঘড়ির দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি। ভাল কথা। ভুলেই যাচ্ছিলাম। সামনের মঙ্গলবার কিন্তু আসতে পারব না।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'কেন? যদি ছুটি মঞ্জুর না করি?'

রঞ্জন বলল, 'কলামন্দিরে একটা ফাংশন আছে। ভ্যারাইটি পারফরমেন্স্। এসব অনুষ্ঠানে আমরা বড় একটা বাজাই না। কিন্তু কয়েকজন বন্ধু আছেন। তাঁরা বিশেষ করে ধরেছেন। তা ছাড়া এটা একটা চ্যারিটি শো। এক নতুন হাসপাতালের জন্যে।'

নন্দিতা খুশি হয়ে বলল, 'ও, বাজাবেন আপনি?'

রঞ্জন বলল, 'তাইতো কথা।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'একা একাই বাজাবেন? আমরা যেতে পারি না?'

'পারবেন না কেন? গেলেই হয়। যদি বলেন কমপ্লিমেণ্টারি কার্ডস পাঠাতে বলব আপনাদের জন্যে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বলছেন চ্যারিটি শো তবে আর কমপ্লিমেণ্টারি কার্ড কেন পাঠাবেন? আমরা টিকিট কেটেই যাব।'

রঞ্জন মৃদু হেসে বলল, 'Charity begins at home.'

ওরা দুজনেই এগিয়ে দেওয়ার জন্যে রঞ্জনের সঙ্গে বাইরে এলেন। যেদিনই আসে কেউ না কেউ তাকে এগিয়ে দেয়। বেশির ভাগ দিনই সঙ্গে আসেন ভবেশবাবু। এখন তিনি অনুপস্থিত। তাই সৌজন্য রক্ষার ভারটুকু নিয়েছেন ওঁরা।

সিঁড়ির কাছে আসতেই নন্দিতা বলল, 'এ মা, সিঁড়ি দেখি অন্ধকার। এখানকার বালবটা কে নিল?

ইন্দ্রাণী বললেন, 'যারা নেয়। শিগগির একটা আলো নিয়ে আয় টর্চটা কোথায়?'

নন্দিতা বলল 'টর্চ তো বাবা নিয়ে গেছেন। আমি মোমবাতিটা নিয়ে আসি। লোডশেডিংয়ের জন্যে সেদিন এনে রাখা হয়েছিল। অনেকগুলি আছে।'

ইন্দ্রাণী বললেন 'তাহলে নিয়ে আয়।'

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, 'না না আলোর কোন দরকার হবে না। আসবার সময়েও অন্ধকারে এসেছি। ঠিক নেমে যেতে পারব।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমরা আপনাকে ওইভাবে নামতে দেব কেন?'

নন্দিতা ততক্ষণে মোমবাতিটা জ্বেলে নিয়ে এসেছে। বেশ বড় একটি মোমবাতি।

ইন্দ্রাণী সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন, নন্দিতা রঞ্জনের আগে আগে চলতে লাগল।

একসময় বলল, 'রেলিংয়ে হাত রাখবেন না কিন্তু। রেলিংটা একেবারে ধুলোয় ভর্তি। পাঁচ ভাড়াটের বাড়ি, কারো কোন যত্ন নেই।'

তারপর নিজেই হাত দিয়ে খানিকটা ধুলো ঝেড়ে দিল। যেন এবার রঞ্জন সেখানে হাত রাখবে।

মোমের আলো রঞ্জনকে অনেক দূরে নিয়ে যায়! সেই ঐতিহাসিক যুগে, যখন ক্ষণপ্রভাকে মানুষ এমন সর্বক্ষণের জন্যে বেঁধে রাখতে শেখেনি। মোমের আলো রঞ্জনের মনে এক অনির্দেশ রোমান্টিক কাব্যময় অনুভূতির সৃষ্টি করে।

একটু আগেও রঞ্জনের মন তমসাচ্ছন্ন ছিল। ক্ষণে ক্ষণে সেই আঁধারের আক্রমণ অনুভব করে রঞ্জন। অবসাদের আঁধার, নৈরাশ্যের আঁধার, কতরকমের কত হীনতা দীনতা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দীপবর্তিনীর এই দীপের আলোয় তা কি ক্ষণিকের জন্যেও বিদূরিত হবে? যদি হয় সেইক্ষণ মাহেন্দ্রক্ষণ।

রঞ্জন ভাবল, মেয়েদের ভালোবাসা সত্যিই কি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয়, নিম্নতল থেকে উর্ধ্বলোকে তুলে নিয়ে যেতে পারে? 'The eternal woman leads us above.' সত্যিই কি তাই? নাকি মহাকবিরাও মহা ফেমিনিস্ট?

সদর দরজা পর্যন্ত এসে নন্দিতা বলল, 'এবার যেতে পারবেন তো? সাবধানে যাবেন।'

ওর চোখে আর ঠোঁটে মোমের আলোর মতোই আর একটু আলো জ্বলে উঠল। সে আলো যেন আরো সুন্দর, আরো স্নিগ্ধ।

নন্দিতা বলল, 'আবার আসবেন।

রঞ্জন বলল, 'আসব।'

॥ ৪ ॥

পাবলিক ফাংশনে আজকাল আর বড় একটা বাজায় না রঞ্জন। বাজাবার সুযোগও তেমন আসে না। শহরে সঙ্গীত-জগতের হাওয়া এখন অন্যদিকে। সে হাওয়া রঞ্জনদের অনুকূলে নয়। যন্ত্রীকে শুধু নিজের আসনে বসে নিজের মনে বাজালেই হয় না সেই আসন ছেড়ে সূক্ষ্ম তার যন্ত্রটি রেখে জয়ঢাক নিয়ে বেরোতে হয় আত্মমহিমা প্রচারের জন্যে। তুমি নিজে যদি প্রচার না করতে পার, বৃহৎ দক্ষতর কোন প্রচারযন্ত্রের সাহায্য নাও। রঞ্জন তা নিতে পারেনি। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে কখনও কখনও হয় না তা নয়। কিন্তু সবাই কি সব কিছু পারে ? প্রবৃত্তি প্রবণতা একেক জনকে একেক রকম করে গড়ে তোলে। তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। যেতে চেষ্টা করলে নিজের কাছেই নিজেকে হাস্যাস্পদ হতে হয়। মনে হয়, 'আমি যেন একটি কমিক রোল প্লে ক'রে চলেছি। আমি যেন আমার ক্যারিকেচার।'

সঙ্গীত-জগতের হাওয়া এখন অন্যদিকে। রঞ্জন অনুভব করে। শুধু অনুভব কেন, সবই দেখতে পায়। যাঁরা খ্যাতনামা আর্টিস্ট তাঁরা তাঁদের পথের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। যুগোপযোগী করে তুলেছেন তাঁদের শিল্প মাধ্যমকে। অলৌকিকতার সঙ্গে মিশেছে তাঁদের লোকরঞ্জনের ক্ষমতা। দেশে-বিদেশে তাঁদের খ্যাতির অন্ত নেই। তাঁরা প্রতিভাবান। সরস্বতীর বরপুত্র। লক্ষ্মীরও। কিন্তু যাঁরা ওই সারির নন, তাঁরাও এখন আসন দখল করে বসেছেন। আছে বিশেষ বিশেষ দল, গোষ্ঠী আছে, কনোশিয়ার ইমপ্রেসারিওরদের ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ আনুকূল্য পক্ষপাত। সেইসব ব্যূহভেদ করে রঞ্জনদেব সাধ্য নেই ভিতরে ঢোকে। অথচ তার তরুণ বয়সে কি যৌবনে অবস্থা অন্য রকম ছিল। ওস্তাদের সঙ্গে সে কত বড় বড় আসরে বাজিয়েছে।

একাও বাজিয়েছে অনেক বৃহৎ অনুষ্ঠানে। এখন সে সব বড় ওস্তাদও আর স্থানীয় কোন বড় আসরে বাজান না। তবে কলকাতার বাইরে দিল্লী লক্ষ্ণৌ বোম্বে মাদ্রাজ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসে। তিনি সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান পেয়েছেন। কয়েকটি কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত। প্রায়ই নানা কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হয়। তিনি নিজেই একটা ইনস্টিটিউশন। তবু রঞ্জনরা মনে করে না, তাঁর যা প্রাপ্য ছিল তিনি তা পাননি। ওস্তাদও অবশ্য প্রচার-বিমুখ। বাইরের সম্মানের চেয়ে আত্ম-সম্মান তাঁর কাছে অনেক বড়। তাঁর কাছে সঙ্গীতের দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার উদাহরণ অনুসরণ করতে চেষ্টা করে রঞ্জন। তবু কি মন মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে না? মনোযন্ত্র কি আর একটি সুরেই বাঁধা থাকে? সে যন্ত্রও কি কখনো কখনো বেসুরো বাজে না, তার ছিঁড়ে যায় না আচমকা?

ওস্তাদ বলেন, 'রঞ্জন, পাওয়াটা শুধু বাইরের নয়, তা ভিতরেরও। অন্যের কাছ থেকে যখন পেতে চাইবে সে মর্জি হলে দেবে না হলে দেবে না। কিন্তু তুমি যখন নিজেই দেনেওয়ালা নিজেই পানেওয়ালা, তোমার পাওনা কেড়ে নেয় কার বাপের সাধ্য।'

রঞ্জন যখন নিজের আসনে বসে নিজের মনে বাজায় তখন অনুভব করে ওস্তাদের কথার চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কিন্তু যখন সেই আসন ছেড়ে ওঠে তখন কি সহস্র শ্রোতার জন্যে মন আকুল হয় না? মনে হয় না কি তার সৃষ্ট সুর যদি হৃদয়ে হৃদয়ে ঝঙ্কৃত না হল তাহলে লাভ কি বাজিয়ে? অন্তর আর বাহির সত্যিই কি রেলের কম্পার্ট-মেণ্টের মত আলাদা করা? অন্তর হল ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্ট, আর বাহির তৃতীয় শ্রেণীর। তা নয়। সহস্র রসিক শ্রোতার অভিনন্দন শিল্পীকে নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। সমঝদার চাই। সমঝদার চাই। এমন কোন কোন আসরে রঞ্জনকে দুর্ভাগ্যক্রমে

বাজাতে হয়েছে যেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজনও সমঝদার ছিল না। সামনের সারিতে সব কাঠের পুতুলের মত বসে আছেন। পুতুল নয় তাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে গণ্যমান্য প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। ভুল জায়গায় তাল ঠুকছেন। লোক দেখানো মাথা নাড়ছেন। সেই সব সঙ্গীত-সভায় সত্যিই কি হাত খুলেছে রঞ্জনের! সমঝদার চাই বইকি, রসিক শ্রোতা চাই বইকি।

রঞ্জন সঙ্গীতের যে ধারার অনুগামী সেই ধারার অবগাহন করার মত রসিক শ্রোতা এখন দুর্লভ। রসের ধারাও সহস্রধারা। কোন ধারা স্থূল, কোন ধারা সূক্ষ্ম। কোন ধারা প্রবল, কোন ধারা মৃদু। কোন ধারা এত মৃদু যে তা প্রায় দুর্নিরীক্ষ। কিন্তু যে সব ধারাকে তুমি বল স্থূল, যাকে বল তুমি লোকসঙ্গীত, সেই সব ধারায় লক্ষ লক্ষ কোটি লোকের আনন্দ। সেই আনন্দের কি কোন মূল্য নেই? তাকে তুমি অস্বীকার কর কি করে?

ওস্তাদ রঞ্জনের এই সব চিন্তাভাবনার কথা জানেন। তিনি বলেন 'অস্বীকার তো করি না। সব সঙ্গীতই সঙ্গীত। সব সঙ্গীতের মধ্যেই সুর আছে। সব সুরেরই স্রোত আছে। তবু তুমি কোন সুর বাজাবে কাদের জন্যে, কোন কোন আসরের জন্যে বাজাবে তোমাকে তা ঠিক করে নিতে হবে। তুমি কি ইচ্ছা করলেই যে কোন সুর তোমার যন্ত্রে বাজাতে পার? তুমি নিজেই কি কেবল যন্ত্রী? তোমার চেয়ে বড় যন্ত্রী কি নেই? তিনি তোমার মধ্যে যে সুর বাজাচ্ছেন তুমি সেই সুরে বেজে উঠছ।'

রঞ্জন মাঝে মাঝে সেই যন্ত্রীর নাম দেয় নিজের প্রবৃত্তি-প্রবণতা, রুচিবুদ্ধি। কিন্তু এসব এল কোথেকে? কতখানি তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, কতখানি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এসেছে, কতটুকু তার স্বোপার্জিত, তার উত্তর মেলে না। অন্তত সুনির্দিষ্ট সদুত্তর তার জানা নেই।

ওস্তাদ বলেন, 'বাবা, আমি তোমাকে যত্ন করে আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে হাতে ধরে হাঁটতে শিখিয়েছি। এখন তুমি হাঁটতে পার, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার, দৌড়াতেও পার। তুমি আমার গর্ব করবার মত তেজীয়ান ঘোড়া। তাই বলে আমার মতামতকে সারা জীবন তোমার পিঠে সওয়ার করে বসিয়ে রাখব তা আমি চাই না। তুমি যদি নিজের পথে নিজের খুশিতে দৌড়াতে চাও দৌড়ও না।'

ওস্তাদ মুখে বলেন বটে এসব কথা, কিন্তু রঞ্জন কি জানে না যারা তাঁর পথের পথিক তারাই তাকে বেশি আনন্দ দেয়? এই আনুগত্যে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হন? তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা একটু ভিন্ন পথে গিয়ে কৃতী হয়েছে, তিনি কি সমান আনন্দে তাদের গ্রহণ করতে পারেন?

কিন্তু ওস্তাদ খুশি হবেন বলেই যে রঞ্জন তাঁর প্রদর্শিত পথে হেঁটে চলেছে তা নয়। এই পথ যেন তার নিজের রুচি আর আনন্দের সঙ্গেও বাঁধা হয়ে রয়েছে। সে কি ইচ্ছা করলেই আর সরে আসতে পারে? পারে না। সে জানে ভিন্ন পথে মুঠোয় মুঠোয় টাকা আছে, হাজার হাজার শ্রোতা আছে, খ্যাতি আর প্রতিপত্তি, তবু সে অন্য পথ নিতে পারে না। এমন কি নিজের পথেও একটি নির্দিষ্ট ঔৎকর্ষের সীমাকে ডিঙিয়ে যাওয়া তার সাধ্যাতীত।

সহস্র জনের অভিনন্দনের আশা নেই। গুটিকতক সহৃদয় শ্রোতা যদি শেষ পর্যন্ত থাকে, কয়েকজন অনুরাগী ছাত্রছাত্রী, তাহলেই যথেষ্ট। আর থাকবে নিজে। নিজের সঙ্গীতের চরম আর পরম শ্রোতা সে কি নিজেই? Art for myself. শুধু কি নিজের জন্যে? শখ করে যে সব ছাত্রছাত্রী রঞ্জনের কাছে শিখতে আসে তাদের যেন রঞ্জন মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়, 'নিজের জন্যে, বাজাও নিজের আনন্দের জন্যে।' একটি চিরজীবনের ছাত্রের প্রতিও তার কি সেই উপদেশ, 'নিজের জন্যে বাজাও, শুধু নিজের জন্যে!'

রঞ্জনের একজন সমবয়সী বন্ধু আছে। সে শিল্পী নয় কিন্তু গান-বাজনার সমঝদার। সাহিত্যের নানা বিভাগে তার পড়াশোনাও বিস্তর। সে-ও অবিবাহিত। যদিও তার বিয়ের সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিল না। সে নিয়েছে ধর্মের পথ। সে তো বলে যে শান্তি পেয়েছে। তার মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। শান্তি যদি পেয়ে থাকে তার চেয়ে পরম প্রাপ্তি আর নেই। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' ধর্মেই ধর্মের শেষ। কিন্তু সঙ্গীতেই কি সঙ্গীতের শেষ? সঙ্গীত সাধনাকে কি ওই স্তরে তোলা যায়! কখনো তুলতে পারবে রঞ্জন?

দুদিন বাদে কলামন্দিরের অনুষ্ঠানে বাজাতে যেতে হবে। সেই প্রসঙ্গে এই সব এলোমেলো ভাবনা তার মাথার মধ্যে হালকা যোগের মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। নিজের ঘরখানা আজ সকালে সেতারের স্কুল হয়ে উঠেছে। সারা ঘর জুড়ে শতরঞ্চি বিছানো। সে বসেছে ঘরের এক প্রান্তে সেতার হাতে নিয়ে। আজ আর কো-এডুকেশন্ নয়। আজ শুধু ছাত্রীদের ক্লাস। একে একে আসতে শুরু করেছে ছাত্রীরা। বেশির ভাগই কন্যাকুমারী। দু একজন আছে শাঁখা সিঁদুরে শোভিতা। কেউ কলেজের ছাত্রী, কেউ বা কলেজের লেকচারার। কেউ বা স্কুলে পড়ায়, কেউ বা অফিসে কাজ করে। কেউ বা হাসপাতালের নার্স, কেউ বা লেডী ডাক্তার।

কিন্তু এই সঙ্গীত-শিক্ষার আসরে সবাইকেই একাসনে বসতে হয়, সমাসনে বসতে দেয় রঞ্জন। কেউ বা খানিকদূর এগিয়েছে কেউ বা এগোতে পারেনি। কেউ বা মেযাজের সুযোগ সময় বেশি পায় কেউ বা অতটা পায় না। তবু এদের সকলের হাতেই একটি করে সেতার। সকলের মনেই অন্তত কিছু সময়ের জন্যে একটি আকাঙ্ক্ষা সেতারী হবার। পরম স্নেহে পরম মমতায় তার ছাত্রীদের দিকে তাকায় রঞ্জন। সে এদের এই আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দেয়। তাদের

প্রত্যেকের মধ্যেই আছে একজন করে প্রচ্ছন্ন শিল্পী, প্রত্যেকের মধ্যেই একটি করে সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা হয়তো সকলের মধ্যে সমভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে না। কিন্তু যতখানি হয় হোক না। রঞ্জন যাকে যতটুকু সাহায্য করতে পারে, তার নিজের দিক থেকে ততটুকুই লাভ।

দেখতে দেখতে ঘর ভরে উঠল। পুরো ঘরটা না হোক, অর্ধেক ঘর। যারা দূর থেকে আসে তাদের আগে শেখায় রঞ্জন। যারা কাছের তারা অপেক্ষা করে।

বেলেঘাটা থেকে আসে নীতা। কালো ছিপছিপে চেহারার মেয়েটি। সুন্দরী নয়, তবু মুখখানা মিষ্টি। স্বভাবও ভালো। মৃদু আর মিতভাষিণী। সেতারের ক্লাসে নীতা মেধাবিনীদের পর্যায়ে পড়ে না। তবে পরিশ্রমী। নানা ধরনের পরিশ্রমই ওকে করতে হয়। টুইশন আছে দুটো কি তিনটি। গান বাজনার নয়, পড়ানোর। সামান্যই তাতে পায়। সেই টাকা থেকে গুরু-দক্ষিণা দেয়।

ওর নিষ্ঠা আর আগ্রহ দেখে, বাড়ির অবস্থার কথা জেনে রঞ্জন বলেছিল, 'তোমাকে কিছু দিতে হবে না।' নীতা বলেছিল, 'সে কি হয় রঞ্জনদা।'

রঞ্জন বুঝেছিল ওর কাছ থেকে কিছু না নিলে ওর আত্মসম্মানে লাগবে। প্রত্যেকেরই সম্মানবোধ আছে।

আজ নীতা ক্লমে ঘরে ঢুকেই রঞ্জনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ছাত্রছাত্রীদের এই প্রণামের ব্যাপারটাকে সে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, 'রোজ তোমাকে প্রণাম করতে হবে না। করতেই যদি হয় বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে করবে।'

নীতা প্রণাম করতেই রঞ্জন বলল, 'কী ব্যাপার আজ কি তোমার জন্মদিন নাকি?'

রঞ্জন লক্ষ্য করল নীতা নতমুখী। অন্য মেয়েরা মুখ টিপে টিপে হাসছে। বুঝতে কিছু বাকি রইল না।

তবু পাশ থেকে রুমা বলল, 'রঞ্জনদা ওর যে বিয়ে। এতদিন চেপে রেখেছিল। আমরা সব জেনে ফেলেছি।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'বিয়ে? বেশ বেশ। পরে শুনব তোমার বিয়ের গল্প। ক্লাসটা শেষ হোক।'

বাবা নেই। বিয়ের জন্যে ওর দাদা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ঠিক হয়ে উঠছিল না। এবার বোধহয় একটা ব্যবস্থা হয়েছে।

ছুটল আর একটি ছাত্রী। নিজের মনে হাসল রঞ্জন। বিয়ের পরে কদাচিৎ মেয়েরা শিখতে আসে। তেমন আগ্রহ থাকে না। সুযোগ সুবিধাটাও কমে যায়।

কমল কৌতুক করে বলে, 'বেশী বয়সের ছাত্রী আর নেব না। একেকটা বিয়ের মরশুমে দু তিনটি করে ছাত্রী কমে যায়। এত করে শেখাই টেখাই। সব পণ্ড। এবার থেকে বাচ্চাদের ক্লাস নেওয়া ধরব। বিয়ের বয়সে এসে পৌঁছতে সময় লাগবে।'

বিয়ের বয়সে এসে পৌঁছলেই কি সময়মত সবাইয়ের বিয়ে হয়? দু একজন অভিভাবক রঞ্জনকে মাঝে মাঝে বলেন, মাষ্টারমশাই দেখবেন তো। আপনার তো কত জানাশোনা। ভালো ভালো ছাত্রও তো আসে আপনার কাছে, ইয়ং অফিসার-টফিসার। দেখবেন তো।'

কমল একথা শুনে বলে, 'অমন কাজও করিসনে। ঘটক-মাস্টার বলে বদনাম রটে যাবে। তাছাড়া কসঙ্গে দুটি স্টুডেণ্ট হারাবি। বরং আমার কোন ছাত্রের সঙ্গে তোর কোন ছাত্রীর সম্বন্ধ যদি করতে পারিস, আমাদের একটা নতুন সম্পর্ক হবে। একজন আর একজনের বেয়াই হব। তোর কাছ থেকে আচ্ছা করে পণ যৌতুক আদায় করে নেব।'

ক্লাস শেষ করতে করতে বেলা দেড়টা বেজে গেল। নীতা তখনো বসে আছে। ওকে কিন্তু অনেক আগেই শিখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে রঞ্জন।

সবাই চলে গেলে নীতা তার দিকে এগিয়ে এল।

রঞ্জন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবু স্মিতমুখে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি কি কিছু বলবে?'

নীতা একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'আপনি কিন্তু যাবেন। দাদা আসবেন চিঠি নিয়ে। তিনি এসে সব বলবেন।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। যাব বইকি, নিশ্চয়ই যাব।'

নীতা আরো একটু অপেক্ষা করল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'জানি না আর আসা হবে কিনা। কোন্ অবস্থায় গিয়ে পড়ব জানি না তো। আমার কিন্তু শেখবার ইচ্ছা আছে রঞ্জনদা। যদি আসতে পারি ফের আমাকে নেবেন তো?'

রঞ্জন বলল, 'নেব বইকি।'

নীতার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। আনন্দের দিনেও অশ্রু।

এ দৃশ্য রঞ্জনের কাছে নতুন নয়। এমন করে আরো কত ছাত্রী তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে! তবু মনে হল নতুন। চিরনতুন।

নীতা আবার নত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করল।

রঞ্জন বাধা দিল না।

ফাংশনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুটি ছেলে এসেছে। ট্যাক্সি নিয়েই হাজির হয়েছে তারা। রঞ্জন তৈরী হয়েই ছিল। সেতারটি নিয়েই গাড়িতে উঠে পড়ল।

বেরোবার আগে বউদি একটু ঠাট্টা করলেন, 'বাব্বা, কি সাজাটাই সেজেছ।'

রঞ্জন বলল, 'আমাকে সাজতে হয় না বউদি। সাজসজ্জা সব তোমাদের জন্যে।'

বউদি বললেন, 'বাব্বা, কী অহংকার। তোমাকে সাজতে হয় না। না সাজলেও তোমাকে সুন্দর দেখায় এই তো? তবু যদি দেড় ঘণ্টা ধরে চুল না আঁচড়াতে। দু ঘণ্টা ধরে কাপড় না কোঁচাতে। বেছে বেছে আবার মটকার পাঞ্জাবিটি পরা হয়েছে। এবার একটি গোড়ে মালা পরা বাকি। দেব নাকি পরিয়ে?'

একটু সাজসজ্জা করেছে বই কি রঞ্জন। কোথাও যেতে হলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে তো হয়। কিন্তু কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত রেয়াজ করেছে রঞ্জন। বউদি সেই সাজসজ্জার খবর রাখেননি।

কি, রাখলেও খেয়াল করেননি। গাড়িতে উঠে রঞ্জনের মনে পড়ল, 'যাঃ, ভবেশবাবুদের জন্যে তো কমপ্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠানো হয়নি। পাঠাবে কি! মাত্র একখানা কার্ডই রঞ্জনকে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বেশি কার্ড মুখ ফুটে যে চেয়ে নিতে পারেনি।

ট্যাক্সি থেকে কলামন্দিরের সামনে নামতেই উদ্যোক্তাদের দু তিনজন এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিলেন, 'আসুন, আসুন, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

ক্লাসিকাল প্রোগ্রাম সাধারণত সবচেয়ে শেষে হয়। এখানে অন্য ব্যবস্থা। ওঁরা তাড়াতাড়ি রঞ্জনের প্রোগ্রামটা সেরে নিয়ে বিচিত্র অনুষ্ঠান শুরু করে দেবেন। আধুনিক গান আছে। শেষে আছে নাটক। তার জন্যই বেশী সময় ধরে রাখা হয়েছে।

দম নেওয়ার অবকাশ পেল না রঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে হল ডায়াসে। সেখানে আর এক বিপত্তি। তবলচি আছে। কিন্তু প্রধান অতিথি আসেননি। একজন লেখকের আসার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে তিনি দুঃখপ্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। সভাপতির আসনে তিনি উপবিষ্ট। কিন্তু প্রধান অতিথির আসন পূর্ণ করে কে?

রঞ্জনের বন্ধু সরোজ এসে কানে কানে বলল, 'তুমিই বসে যাও ভাই। তোমার নামই প্রস্তাব করে দিই।'

রঞ্জন বলল, 'সে কি কথা। আমি যে কিছুই বলতে পারি না।' বন্ধু কানে বলল, 'তুমি বুঝি শুধু কানে কানে কথা বলায় ওস্তাদ? তোমাকে কিছু বলতে হবে না। শুধু চেয়ারে একবার গিয়ে বসবে। আর মাইকের সামনে একবার গিয়ে দাঁড়াবে। তাহলেই যথেষ্ট।'

তাই করতে হল। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সভাপতি, প্রধান অতিথি নির্বাচন, বরণ, মাল্যদান। বরমাল্য একটি পেয়ে গেল রঞ্জন। গলা থেকে নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল সামনের সারির বাঁদিকের আসনে। আরে, ওঁরা যে এসেছেন। ইন্দ্রাণী আর নন্দিতা। একেবারে প্রথম সারির টিকিট কেটেছেন।

এই বন্ধুপ্রীতি মূককে বাচাল করতে পারত। কিন্তু বাচাল হবার মত সময় কই। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দুচার কথা বলল রঞ্জন। একটু হেসে বলল, 'আমার বাকি কথা আমার যন্ত্রে শুনবেন। সুরই আমার ভাষণ।'

যদি বলতে পারত সুরই আমার জীবন তাহলে কি চমৎকারই না হত। কিন্তু সত্য হত কি? জীবন যে সরু তারেও বাজে, মোটা তারেও বাজে। শুধু কি তাই? তা যে সুরে বাজে, বেসুরেও বাজে।

সেতার নিয়ে বসবার আগে বন্ধু ফের এসে চুপি চুপি বলল, 'বেশি সময় নিয়ো না ভাই। তোমার জন্যে চল্লিশ মিনিট বরাদ্দ।'

পরম যত্নে সেতারটি তুলে নিল রঞ্জন। স্মরণ করল ওস্তাদের নাম। হল ভরে গেছে লোকে। কিন্তু এ আসর ক্লাসিক গানের আসর নয়। বিচিত্র রুচির মানুষ এসেছে বিচিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তবু তার সঙ্গীতের সমঝদারও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে।

আধ ঘণ্টাখানেক ইমন বাজাল রঞ্জন। তারপর বাকি সময়টুকু ঠুংরী অঙ্গে খাম্বাজ। না, বরাদ্দের চেয়ে বেশি সময় নেয়নি। বরং

বরাদ্দের চেয়ে দু এক মিনিট কমই হবে। কিন্তু যতক্ষণ বাজিয়েছে তন্ময় হয়ে বাজিয়েছে। বাজাতে বাজাতে ভুলে যেতে পেরেছে কোথায় বসে বাজাচ্ছে, কাদের অনুরোধে। সময় সময় মনে হয় এই তন্ময়তা, এই বিস্মরণ, এই দুর্লভ আত্মবিস্মরণই শিল্পীর পরম পুরস্কার। কিন্তু এ আনন্দ তাৎক্ষণিক। কিন্তু একটু ভেবে দেখতে গেলে জীবনে কী বা ক্ষণিক নয়।

হাততালি পড়ল। দু চারজনের নয়, অনেকেরই। হয়তো এক জনকে তালি দিতে দেখলে আরো অনেকের দিতে ইচ্ছা করে। অনুষ্ঠান শেষ করে রঞ্জন উঠে পড়ল।

বন্ধুটি মালাটি ফের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'কিছুক্ষণ বসে গেলে পারতে। তোমরা আর্টিস্টরা বড় স্বার্থপর, নিজের গান নিজের বাজনা ছাড়া আর কিছু শুনতে চাও না।'

রঞ্জন বলল, 'না ভাই, দরকারী কাজ আছে। না হলে থাকতাম।'

না না করেও কিছু জলযোগ গ্রহণ করতে হল।

গেটের কাছে এসে দেখে ইন্দ্রাণীও কখন উঠে এসেছে। নন্দিতা এসেছে মায়ের পিছনে পিছনে।

রঞ্জন বলল, 'একি, আপনারা উঠে এলেন যে?'

ইন্দ্রাণী বলছেন, 'আর থেকে কি হবে? যা শুনতে এসেছিলাম তা তো শোনাই হয়ে গেল।'

রঞ্জন জানে মা মেয়ে কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল ওঁরা যে রসের সমঝদার তাও কি অনুচ্চ?

ইন্দ্রাণী পরেছেন সিল্কের শাড়ি। রঞ্জনের জামার রঙের সঙ্গে কী করে যেন মিলে গেছে। নন্দিতার পরণে নীলাম্বরী। এও নিশ্চয়ই সিল্কের। নীল রঙের ওপর রঞ্জনের পক্ষপাত।

বন্ধু ট্যাক্সি ডেকে দিল। ভাড়ার টাকাটা হিসাব করে পকেটে

গুঁজে দিয়ে বলল, 'সঙ্গে যেতে পারলাম না। কিছু মনে করো না। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'বোধ হয় গেলাম না বলেই বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে।'

ট্যাক্সিতে প্রথম উঠলেন ইন্দ্রাণী, তারপর নন্দিতা, তারপর রঞ্জন।

'ভবেশবাবু এলেন না ? অফিসের কাজে ব্যস্ত বুঝি ?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'কোথায় অফিস ? একবার এসেছিলেন। কদিন থেকে আবার গেছেন সেই গাঁয়ে। বিষয় সম্পত্তি দেখতে। যেন কত মহা জমিদারী পড়ে আছে সেখানে।'

একটু বাদে রঞ্জন বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'কেন বলুন তো।'

'আপনারা কত টাকা দিয়ে টিকিট কিনলেন। অথচ কিছুই দেখলেন না, শুনলেন না। নন্দিতা, তুমি তো থাকতে পারতে।'

নন্দিতা বললে, 'আমি বুঝি একা একাই থাকব ?'

একা একা কি নন্দিতা থাকে না ? ঠিক একা নয়। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে ? সেখানে নিশ্চয়ই ওর অন্য মূর্তি। সেখানে নিশ্চয়ই ইন্দ্রাণীর মতই ও উজ্জ্বলা। সেখানে নিশ্চয়ই ও এমন ধীর শান্ত সরোবরের মত নয়। সেখানে ও রঙ্গিনী তরঙ্গিনী।

সেই জগৎ হয়তো খুব একটা আলাদা কিছু নয়। এমন নয় যে রঞ্জন তা কল্পনা করতে পারে না। তবু স্বাদে গন্ধে রূপে রুচিতে সে জগৎ যে স্বতন্ত্র তা মানতেই হবে। নন্দিতা যে জগতের স্থায়ী অধিবাসিনী, রঞ্জন সেখানে অপ্রধান অতিথি মাত্র।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পার হয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে উত্তরমুখে। আলোয় উজ্জ্বল নৈশ নগরী। রাজপথ যানে-জনে আকীর্ণ। ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে লাল আলোর সঙ্কেতে।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আপনার বাজনা খুব ভালো লাগল। আমাদের

ঘরেও তো কতদিন বাজিয়েছেন কিন্তু এত ভালো আর শুনিনি। আপনারা বুঝি ঘরে একরকম বাইরে আর একরকম বাজান ? আসর বুঝে বাজান ?'

সত্যি সত্যি তেমন কোন বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ইন্দ্রাণী আর নন্দিতা যদি উপস্থিত থাকতেন, আরো বড় বড় গুণী আর সমঝদারদের মধ্যে রঞ্জন যদি আরো বেশী সময় নিয়ে বাজাতে পারত তাহলে এই দুটি নারীকে বিশেষ করে নন্দিতাকে তার সুর-সম্পদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত। তার তো আর কোন সম্পদ নেই ওই সুর ছাড়া। তার সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত পৌরুষ, ক্ষমতার সমস্ত দীপ্তি ওই সেতারের তার কটির সঙ্গে বাঁধা।

ঈশ্বর কোথায় আছেন ? স্বে মহিম্নি। ঈশ্বরের স্রষ্টা মানুষ. আবার এই অকল্পনীয় ধারনাতীত বিশাল সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিনিধি যে মানুষ সেও বাস করে নিজের যৎসামান্য মহিমাটুকুর মধ্যে। অন্তত বাস করতে চায়।

নন্দিতা বলল, 'ও কথা কেন বলছ মা। উনি আমাদের বাড়ির ঘরোয়া আসরেও মাঝে মাঝে যথেষ্ট ভালো বাজিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মত অরসিকের সুখ্যাতিতে কি ওঁর মন ভরবে ?'

এইটুকুতেই মন কিন্তু ভরে উঠল রঞ্জনের। হেসে বলল, 'আজ দেখছি খুব বিনয় করছ।'

নন্দিতা মাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'শুনছ মা আমি নাকি শুধু আজই বিনয় করছি। কবে আমাকে দুর্বিনীতা দেখেছেন বলুনতো ?'

তা ঠিক। বিনয়ের অভাব ওর কোন দিন হয়নি। অন্তত রঞ্জনের কাছে তো নয়ই। তবু মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনার আসরে নন্দিতাকে ওর বাবার প্রতিনিধি হতে দেখেছে রঞ্জন। তেজের সঙ্গে প্রকাশ করেছে সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতিতে ওর ভিন্নমত, ভিন্ন রুচির কথা। সেখানে মাঝে মাঝে ও উষ্ণ উগ্রতার সীমান্ত ঘেঁষে

গেছে। নন্দিতা যেন একাই তার কালের প্রতিনিধি। একাই এক অক্ষৌহিনী। রঞ্জন কখনো এপক্ষে কখনো ওপক্ষে যোগ দিয়েছে। কখনো বা নিরপেক্ষ থেকে বাপ মেয়ের দ্বৈরথ সমর উপভোগ করেছে। আর ভেবেছে এর নামই কি কালান্তর? এই কাল পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতিতে চিহ্নিত নয়। কালের রূপ আর রূপান্তর দেখতে হয় মানুষের রুচির নিত্য পরিবর্তনে।

শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমাদের বাড়িতে যাবেন তো? তাহলে টালা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়াই তো ভালো।'

রঞ্জনের হঠাৎ যেন খেয়াল হল, তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমাকে একটা অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

'অন্য জায়গায় মানে?'

রঞ্জন কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আর একজন বন্ধুর বাড়িতে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বন্ধু না বান্ধবী?'

রঞ্জন একটু হেসে বলল, 'বন্ধুই। সে-ও আমার মত সেতার বাজায়। আমার চেয়েও ভালো বাজায়। মানে বাজাত।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'এখন আর তিনি বাজান না বুঝি?'

রঞ্জন বলল, 'বাজাতে পারে না। আর্থাইটিসে একেবারে অবশ অচল হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশী গেছে ওর হাত দুখানা। ও এখন আর বাজায় না, শোনে। শুনতে খুব ভালোবাসে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়ার আগে আমি প্রায় প্রতি মঙ্গলবার যেতাম ওর ওখানে। গানবাজনার আলোচনা হত। মাঝে মাঝে ওকে বাজিয়ে শোনাতাম। ওর যে সে কি আনন্দ! বলত, 'ভাই তোর বাজনা শুনে মনে হয় আমিই বাজাচ্ছি।'

একটু থামল রঞ্জন। তারপর একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'অনেক দিন আর যাওয়া হয়না। সময় পাইনা। ওর শরীর আরো

খারাপ হয়েছে। বার বার খবর পাঠাচ্ছিল। কথা দিয়েছিলাম আজ যাব। সর্দারজী, রোককে হিঁয়াপর।'

ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারের হাতে আগাম টাকাটা দিয়ে দিল রঞ্জন। নির্দেশ দিল কোথায় তুজন আরোহিনীকে পৌঁছে দিতে হবে।

সেতারটা বগলে নিল, কিন্তু মালাটা নিতে গিয়ে বলল, 'না এটা আর ওর বাড়ীতে নিয়ে যাব না।' তারপর ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে বলল, 'দয়া করে মালাটা নিয়ে যাবেন?'

ইন্দ্রাণী একটু হেসে বললেন, 'দয়ার কথাই যদি বলেন তাহলে নেব। মায়াদয়া সকলের মধ্যেই আছে।'

রঞ্জন কথা বলল ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, মালাটি কিন্তু দিল নন্দিতার হাতে। অবশ্য সেই এখন ধারে বসেছিল।

ইন্দ্রাণী পরিহাসের সুরে বললেন, 'মালাটা তাহলে কাকে দিলেন একটু মন খুলে বলুনতো?'

রঞ্জন একটু যেন অপ্রস্তুত হল। তারপর হেসে বলল, 'তুজনকেই।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আপনার সখতো কম নয়। আপনি একই মালার বাঁধনে তুজনকে বাঁধতে চান।'

রঞ্জন একটু অপ্রস্তুত হল। তারপর হেসে বলল, 'তার চেয়েও কোমল, নিবিড় মধুর বন্ধনে আপনারা কি বাঁধা হয়ে থাকেন নি?'

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রঞ্জন সরু গলির পথ দিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। বন্ধুকে শুধু বাজনা শুনিয়ে এলেই হয় না। ওষুধ পথ্যের জন্য মাঝে মাঝে কিছু দিতেও হয়। ওর স্ত্রী একটা স্কুলে কাজ করে। সামান্য মাইনে পায়। কী করে যে চালায় সেই জানে। ছেলেমেয়ে আছে তিনটি।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ যেন অসিতের বাড়িতে ঠিক যেতে ইচ্ছা করছিল না রঞ্জনের। রুগ্নের জগৎ তুঃখের জগৎ উৎসব আনন্দ সম্ভোগ উপভোগের জগৎ থেকে কত আলাদা। আর এই রোগ ব্যাধি তুঃখ

দুর্দশা জীবনে কোন না কোন সময়ে সকলকেই আক্রমণ করে। কে তার হাত থেকে রক্ষা পায়? তবু সুস্থ আর সুখীরা যেন আলাদা জাতের। দাতা আর গ্রহীতা। কিন্তু কাকে যে কখন হাত পেতে গ্রহণ করতে হয় তার কি কিছু ঠিক আছে?

দান আর গ্রহণের সম্পর্ক কি ইন্দ্রাণীদের সঙ্গেও? মালাটি যখন সে নন্দিতাকে দিল তখন সেকি প্রার্থীও ছিল না? সেই প্রার্থনা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়েছে। দেখেছ ওর হাসিমুখ, প্রসন্ন কোমল দৃষ্টি, পেয়েছে সৌহৃদ্যেব আশ্বাস। আবার কি! দান আর গ্রহণের একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণবলয় এখানেই সম্পূর্ণ। এর বেশি কিছু দিতে চাইলে ফর্মটি নষ্ট হবে।

দুই নারী। একজন rich in form আর একজন richer in content. মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে সে তত টের পায় ফর্মের চেয়ে কনটেন্ট বড়। তার কাছে বিষয় গৌরবের স্বীকৃতি দিনে দিনে বাড়ে। কিন্তু কি জীবনে কি শিল্পে ফর্মকে সে কি কখনোই ছাড়তে পারে? তার শিল্পী ভাবনায় রূপ আর সত্তা কখন যে আসন বদল করে তা সে টেরও পায় না। যখন তারা একাসনে বসে অঙ্গাঙ্গী হয়, একাত্ম হয় তখনই সে সার্থকতা পায়।

তারপর ভবেশবাবুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের প্রথম বছর পূর্ণ হতে তখন মাস খানেক বাকি। ভদ্রলোক সেদিন এসে উপস্থিত হলেন রঞ্জনদের বাইরের ঘরে। লেট মর্নিংয়েই এলেন। রঞ্জন আজও রেয়াজ করছিল-খবর পেয়ে সেতারটি নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে এল। হেসে বলল, 'আসুন আসুন ভিতরে আসুন।'

ভবেশবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'না রঞ্জনবাবু, ভিতরে আজ আর যাব না, একটু তাড়া আছে।'

রঞ্জন বলল, 'আসুন এককাপ চা অন্তত খান।'

ভবেশবাবু প্রসন্ন ভাবে বললেন, 'তা খেতে পারি।'

রঞ্জন বসল তাঁর মুখোমুখি। এই মানুষটিকে সে কখনোই অপ্রসন্ন দেখেনি। কিন্তু আজ যেন আনন্দের মাত্রা একটু বেশি। রঞ্জন বলল, 'কী ব্যাপার ?'

ভবেশবাবু বললেন, 'ব্যাপার একটু আছে। আমি আপনার কাছে কিছুদিনের জন্যে ছুটি চাইছি।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'বেশ তো।'

ভবেশবাবু বললেন, 'অফিস থেকেও ছুটি নিয়েছি। অবলিগেটারি লীভ। অনেকদিনের ছুটি জমে ছিল।'

রঞ্জন বলল, 'বাইরে টাইরে কোথাও যাবেন নাকি ?'

'না মশাই। বাইরে যাওয়ার সময় কোথায় এখন ? ভেবেছি কাজ কর্ম মিটে গেলে পরে যাব। মেয়ের বিয়ে।'

রঞ্জন ব্যাপারটা আগেই অনুমান করেছিল। একটু চুপ করে রইল। এই তো পরম প্রত্যাশিত পরম প্রার্থিত সংবাদ। তবু জবাব দিতে একটু যেন দেরি হল। কিন্তু পাছে বেশি দেরি হয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি হেসে বলল, 'বেশ তো বেশ তো। কবে ?'

ভবেশবাবু বললেন 'এখন দেরি আছে। চিঠিপত্র এখন ছাপতে দিইনি। পরে দেব। আপনি কিন্তু চিঠির একটা খসড়া করে দেবেন। খুব অরিজিনাল হওয়া চাই। আর চিঠির ডিজাইনটাও আপনাকে দিয়ে বাছিয়ে নেব। আপনি এঁকে দিতে পারলে আরো ভাল হয়। আপনার তো আঁকা-টাকাও আসে দেখেছি।'

চা এল। ভবেশবাবু তৃপ্তির সঙ্গে কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'শেষপর্যন্ত হিন্দুমতেই বিয়ে হবে। পাত্রের তাতে মত ছিল না। সে রেজিস্ট্রেশনের পক্ষপাতী। কিন্তু মা আর মেয়ের দুজনেরই ইচ্ছে আচার অনুষ্ঠান হোক। এই নিয়ে চলছিল চিঠি লেখালেখি। মতান্তর ! তা প্রায় মনান্তরের সীমায় গিয়ে ঢোকে আর কি। কিন্তু ঢোকেনি এই রক্ষা। সে-ও কিছু ছেড়েছে, মিনিও কিছু ছেড়েছে।

আচার অনুষ্ঠান হবে। তবে অনেক বাদ-সাদ দিয়ে। রুচিসম্মত ভাবে। কার রুচি সেটা বলা শক্ত।'

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলে কি জানাশোনার মধ্যে?' বলেই লজ্জিত হল। ছি ছি, কেন এই কৌতূহল। জেনে কি হবে। জানাবার হলে ওরাই জানাবেন।

ভবেশবাবু হেসে বললেন 'হ্যাঁ। জানাশোনার মধ্যেই। তবে মিনির জানা শোনা। আর সবই আমাকে করতে হবে—রঞ্জনবাবু। হিন্দু বিয়ে মানেই এক মহাযজ্ঞ। আগে তো ছিল এক অতিকায় উৎসব। ছেলেবেলায় দেখেছি। তখন লোকের শক্তি সামর্থ ছিল, সময়ও ছিল, ওই সব করে আনন্দও পেত। এখন কি আর সেই দিন আছে? আমি স্ত্রীকে রোজই বোঝাচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের লজিক আলাদা। ডিটাকটিভ ইনডাকটিভ কোন পর্যায়েই পড়ে না।'

একটু হাসলেন ভবেশবাবু। তারপর আবার বললেন 'সবই করতে হবে। ছুটোছুটি কিছুই বাদ যাবে না। শুধু পাত্র খোঁজার দায় থেকে মেয়ে আমাকে রেহাই দিয়েছে।'

ভবেশবাবুর কথাশুনে মনে হল নন্দিতার এই নির্বাচন ওঁদের সানন্দে অনুমোদন পেয়েছে।

'নাম-ধাম আজই বলতে পারতাম। কিন্তু বলার উপায় নেই, মেয়ের কঠোর নিষেধ। এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই মেয়ে আমার মুখে হাত চেপে ধরে। ছেলেবেলায় যেমন করত। তখন কি শুধু হাত? তুলতুলে ঠোঁট চেপে ধরত মুখে। এখন হাত চেপে ধরলে আমি সে হাত ছাড়িয়ে নিই না। ওর হাতের ওপর আমার হাতখানাও চেপে ধরি। গোপনতার দেওয়ালটা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। কতদিনই বা ওকে কাছে রাখতে পারব।'

ভবেশবাবু একটু হাসলেন। আজকের সেই হাসিতে আসন্ন বিদায় বেদনার ছোঁয়া লেগেছে।

বোধহয় প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যেই একটু বাদে ভবেশবাবু বললেন, 'আপনার চা টি বড় ভাল।'

রঞ্জন বলল, 'আর এক কাপ এনে দেব? খান না আর এক কাপ। লাইট করে করে দেব।'

ভবেশবাবু মাথা নাড়লেন, 'না না। আর দরকার নেই।' কিন্তু যে প্রসঙ্গ তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গই ঘুরে-ফিরে আবার এসে তাঁর মনে জুড়ে বসল। আজ যেন মেয়ের কথা তাঁর আর ফুরোতে চায় না।

ভবেশবাবু বললেন, 'আমার কিছুই জানাবার উপায় নেই। কঠিন নিষেধ। ও নিজেই এসে আপনাকে জানাবে। নিজেই আসবে। আপনি তো ওর বন্ধু। আমার মেয়ে খুব চাপা, খুব একগুঁয়ে। কিন্তু বড় ভাল, বড় ভাল।'

রঞ্জন ভাবল জানাবার সুযোগ নিশ্চয়ই এত দিন অনেক এসেছে। কিন্তু নন্দিতা তাকে কিছুই জানায়নি। হয়তো গোপনতাই ওর প্রিয়। Clandestine relationship। তাকি রঞ্জনের নিজেরও প্রিয় নয়? মাঝে মাঝে মনে হয়। যথার্থ সম্পর্কের চেয়ে শব্দটির ধ্বনিমাধুর্য তাকে যেন আরো বেশি মুগ্ধ করে।

একদিন কিন্তু জানার উপলক্ষ প্রায় এসে গিয়েছিল। সেদিন ছিল প্রিয়া সিনেমা হলে এক গায়ক বন্ধুর স্মৃতিসভা। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান।

রঞ্জন নন্দিতাকে বলেছিল, 'যাবে নাকি? বক্তৃতার ব্যাপার নেই। গানবাজনার আসরই হবে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের কয়েকজন আর্টিস্টও আসবেন।'

নন্দিতা বলেছিল, 'তা যেতে পারি।'

বাসে করেই গিয়েছিল। ভিড়ের বাস। ট্যাক্সি করেও যেতে পারত। কিন্তু কী জানি যদি ওর কোন সংকোচ হয়।

রঞ্জন বলেছিল, 'এই ভিড়ের মধ্যে তোমার কষ্ট হল।'

নন্দিতা জবাব দিয়েছিল, 'বাঃরে, ভিড়ে বুঝি আমি আর যাই না। আমার সব অভ্যাস আছে। আমার ভিড়ই ভালো লাগে।'

রঞ্জন বলেছিল, 'এই তো শুনি তুমি লোকজনের মধ্যে যেতে চাও না।'

নন্দিতা জবাব দিয়েছিল, 'ভিড়ও তো এক হিসাবে নির্জন।'

বন্ধুর স্মৃতিসভায় সেদিন রঞ্জনকে বাজাতে হয়নি। কিন্তু ডায়াসে উঠে বসতে হয়েছিল। স্মৃতিচারণ হিসাবে দু চার কথা বলেও ছিল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু চোখ ছিল নন্দিতার দিকে। সে শ্রোতাদের সারিতে বসেছিল। কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকেনি। অনুষ্ঠানের মাঝখানে কখন উঠে চলে গেছে। গান শোনার দিকে যেন তার মন ছিল না। অনুষ্ঠানের শেষে আবার সে ফিরে এসেছিল।

বেরিয়ে এসে রঞ্জন দেখল দোরের কাছে ও অপেক্ষা করছে।

রঞ্জন বলেছিল, 'আমি ভাবলাম তুমি বুঝি চলেই গেছ। নন্দিতা বলেছিল, 'বাঃরে, চলে যাব কেন? আপনাকে ফেলে চলে যাব?

রঞ্জন বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি হারিয়েই গেলে।'

'হারিয়ে যাব কেন? আমি কি পথ-ঘাট চিনি না? হারিয়ে যাওয়া অত সোজা?'

'কোথায় গিয়েছিলে তাহলে?'

অসঙ্গত প্রশ্ন। রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছিল না করলেই ভালো হত।

নন্দিতা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'গিয়েছিলাম একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সে বাইরে থাকে, দু দিনের জন্যে এসেছে।'

তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বলেছিল, 'চলুন এবার বাসে উঠে পড়া যাক। কত বেলা হয়ে গেছে দেখুন। বাব্বা, কী রোদ।'

সঙ্গে সঙ্গে বাস মিলেছিল। মিলেছিল পাশের সিটটিও।

রঞ্জন বলেছিল, 'সত্যিই রোদটা খুব চড়া। গরমও পড়েছে। তোমার খুব কষ্ট হল।'. নন্দিতা সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিল, 'আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। কষ্ট হল বরং আপনার।'

যেন সেই কষ্ট দূর করবার জন্যেই সারাটা পথ গল্প করতে করতে এসেছিল। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা। কোন বিজয় গৌরব নেই সেই বচনধারায়। তবু তা অনির্বচনীয়।

নন্দিতা ভুলেও তার বন্ধুর কথা তোলেনি। হয়তো ইচ্ছা করেই তোলেনি। নয়তো নিপুণ দক্ষতায় এড়িয়ে গেছে। হয়তো অনুপস্থিত বন্ধু তার মনে সব সময় উপস্থিত ছিল না।

ওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর রঞ্জনের মনে হয়েছিল প্রিয়-বন্ধুর স্মৃতিসভায় এসে সে-ই বা তার বন্ধুকে কবার স্মরণ করেছে! নিতান্তই যেন এক বার্ষিক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্মরণ সভায় মৃত বন্ধুর স্মৃতি সভায় এসে আত্মবিস্মৃত রঞ্জন যৌবন দীপ্ত বান্ধবীকে অন্তরের সব প্রীতি উজাড় করে দিয়েছে। মৃত্যু নিষ্ঠুর, কিন্তু জীবন নিষ্ঠুরতর।

ভবেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'এবার চলি রঞ্জনবাবু ; আপনার আর সময় নষ্ট করব না। আপনি বোধহয় আজও রেয়াজে বসেছিলেন। আবার যেতে হবে আমার সেই গাঁয়ের বাড়িতে। মহা ঝঞ্ঝাট। কাজও এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু সেবার গিয়ে বড় আনন্দ পেয়ে-ছিলাম মশাই। বারবার মনে হচ্ছিল। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হত। আপনিও খুব আনন্দ পেতেন।'

'কি রকম।'

ভবেশবাবু বললেন, 'গ্রামের আর কিছু নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটুকু আছে। গ্রীন সাইট দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেবার শুধু সবুজ দৃশ্যই দেখে আসিনি। দেখেছি রক্তবর্ণের শোভা।

আমাদের বাড়ির কাছেই একটি পলাশ বন আছে। শিমূল আর পলাশ। একা একা গিয়ে ঢুকেছিলাম। দেখলাম আকাশ একেবারে লাল হয়ে গেছে। একেবারে আগুনের মত লাল। সে যে কি শোভা।'

রঞ্জন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। ভবেশবাবু বললেন, 'মজা দেখুন। আগুনকে আমরা সবাই ভয় করি। কিন্তু আগুনের রং কী মনোহরণই না করে। রক্ত রঙ তো আমাদের উৎসবেরও রঙ, কী বলুন ?'

রঞ্জন সায় দিয়ে বলল, 'তা বটে।'

তোমাকে অবশ্য খুঁজে বের করেছিল একটি ছেলেই। আমার স্বামীর বন্ধু সলিল দত্ত। তাঁর ফোটো তোলার বাতিক আছে। বিয়ের সময় আমাদের কত যে ফোটো তুলেছিলেন তার ঠিক নেই। বিয়েতে পাওয়া একরাশ উপহারের জিনিষ পত্রের ভিতর থেকে অয়েলপেপারে মোড়া তোমার এই মূর্তিটি টেনে বার করেছিলেন, 'আরে শুভেন্দু, তুমি যে একটি ভেনাস পেয়েছ।'

আমার স্বামী দুষ্টুমী করে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন—'তাই নাকি ?'

সলিলবাবু তোমার মূর্তিটি—উচু করে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আহা, তোমার ও ভেনাসের কথা বলছিনে। এই ভেনাস।'

আরও দুই একটি বিয়ে বাড়িতে দেখেছি, এই মূর্তি। যখন যে ফ্যাশন ওঠে। উপহারও বেশ চালু হয়ে গেছে দেখছি।

জানো এই ভেনাসের বয়স কত ?

স্বামী বলেছিলেন তা আর জানব না কেন ? বউভাতের পর তিন দিন কাটলো।

সলিলবাবু বলেছিলেন, তোমার বিয়ের তারিখ থেকে বুঝি নতুন সাল গোনা শুরু হবে, এই ভেনাস কি আজকের ? থার্ড সেঞ্চুরী বি সি-র মাঝামাঝি এর জন্ম লগ্ন।

আমি সত্যিই সেদিন বোকামি করে ফেলেছিলাম। অবাক হয়ে বলেছিলাম, বলেন কি ? কৃষ্ণনগরের ওই মাটির মূর্তিটি অত আগের কি করে হবে ?

সলিলবাবু হেসে উঠেছিলেন।

আমার স্বামী রাগ করে বলেছিলেন, 'যা জানোনা, তা বলতে যাও কেন।'

সলিলবাবু হেসে বলেছিলেন, 'ওঁকে ধমকাচ্ছো কেন। তুমি

নিজেই কি বলতে পারো? ক্লিনিক্যাল লেবরেটরির বাইরে তোমারই বা কি জ্ঞানটা আছে শুনি?

তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেছিলেন; আসল মূর্তিটি কৃষ্ণ-নগরের নয়, রোমনগরের। মার্বেল পাথরের তৈরী এই মূর্তিটির নাম ভেনাস অফ মিলো। শোনা যায়, সিসিলির কাছাকাছি মিলো দ্বীপে একে পাওয়া গেছে। এখন লুভার মিউজিয়মে আছে। যদি কোনদিন প্যারিস যান দেখতে পাবেন।'

আমার স্বামী বললেন, 'পরশুই যাচ্ছি হনিমুনে, ভেব না সলিল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

সলিলবাবু হেসে বললেন, 'এমন কিছু অসম্ভব নয়, ইউরোপ অনেকের কাছেই আজকাল এপাড়া আর ওপাড়া।'

আমি বললাম, 'কে তৈরী করেছিলেন এ মূর্তি।' তিনি বললেন, 'তাঁর নাম এখনও জানা যায়নি।'

সেই অজানা ভাস্করের জন্যে আমার কেমন যেন একটু দুঃখ হল। আহা তাঁর নামটাই আমরা কেউ জানতে পারলাম না।

'আর ওই ভাঙা দুখানা হাত?'

সলিলবাবু বললেন, 'মূল শিল্পী যে হাত দুখানা কি ভাবে রেখে ছিলেন, তা কেউ বলতে পারে না।'

বললাম, 'কেউ জুড়ে দিলেই পারত।'

তিনি বললেন, 'কে জুড়তে যাবে? শুনেছি জাল হাত নাকি অনেকবার বাজারে বিক্রি করবার চেষ্টা হয়েছে। ওই দুখানা ভাঙা হাত নিয়েই ভেনাস অফ মিলো অক্ষয় সৌন্দর্য্যের আধার হয়ে রয়েছেন। যুগ যুগ ধরে দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছেন।'

আমি বললাম, 'হাত দুখানা ভাঙল কি করে? সলিলবাবু কি •বলবার আগে তাঁর বন্ধু জবাব দিলেন 'নিশ্চয়ই কোন অবৈধ কাজ করতে যাচ্ছিলেন। সেই শাস্তি।'

সলিলবাবু হেসে বললেন, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য।' তিনি চলে গেলে স্বামী বললেন, 'কী যে বোকার মত কথা বলেছিলে—'

একথা শুনে মনে মনে আমার রাগ হল। ভাবলাম, যার জন্যে আমার বোকামি ধরপাকড় তাকে আমার ঘরে রাখব না। কিন্তু করলাম ঠিক উল্টো। অয়েল পেপারের মোড়ক খসিয়ে তোমাকে সযত্নে আমাদের শোয়ার ঘরে প্রতিষ্ঠা করলাম। পাশে রাখলাম ছোট্ট একটা ফুলদানি। রোজ আমি ফুলে ভরে দিয়েছি। না, দেব-দেবীর মত ফুল তোমার পায়ে দিইনি, তোমার যদি হাত থাকত, হাতে দিতাম, যদি সম্ভব হত খোঁপায় গুঁজে দিতাম। যারা তোমার পূজো করেছে, তারা করুক, তুমি আমার সখি। তুমি যে দ্বিতীয় আমি।

ননদ নন্দিতা এসে দেখে গেল। বলল, 'বাঃ বৌদি সুন্দর সাজিয়েছ তো। তবে, দাদা কিন্তু তোমার দিকে আর তাকাবে না। ওই ভেনাসের মুখোমুখি হ'য়ে বসে থাকবে।'

আমি বললাম, 'ঈস্ থাকলেই হ'ল।'

নন্দিতা বলল, 'কী অহংকার। তুমি কি ভেনাসের চেয়েও সুন্দরী। আমি বললাম, 'আমি আর কারো মত হ'তে যাবো কেন? আমি আমার মত।'

মা (মানে শাশুড়ী—ভেনাস তোমাকে চেনানো বৃথা। তোমার মাও নেই শাশুড়ীও নেই। একজনকে ডাকতে গেলে আর একজনের কথা তোমার মনে পড়ে না।) এসে দেখে গেলেন! বললেন 'বেশ হয়েছে।'

কিন্তু বুড়ি দিদি শাশুড়ী আমার ঘরে এসে কোমর খানা আরও বাঁকিয়ে বললেন, 'এ আবার কোন দেবতা?'

আমি সলিলবাবুর কাছ থেকে শোনা তোমার পরিচয়টুকু জানিয়ে দিলাম। তুমি যে রোমের রমণীয়া দেবী, সে কথা বললাম তাঁকে।

ঠাকুরমা সে কথা শুনে বললেন, 'কি রকম দেবীরে তোদের? লজ্জাশরম একেবারেই নেই। বুকে একখানা কাপড়ও জোটেনি?'

আমি বললাম, 'আমাদের মা-কালীর কতখানি লজ্জা আছে ঠাকুরমা?'

তিনি বললেন, 'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। মা-কালীকে দেখে যে ভক্তিভাব আসে, সেই ভাব একে দেখে জাগে নাকি? অভক্তি।'

ঠাকুরমার অশ্রদ্ধা, অভক্তিতে নিশ্চয়ই তুমি কিছু মনে করনি ভেনাস। মনে মনে হেসেছ। বুড়োবুড়ীরা কি বলেন না বলেন, তাতে তোমার কীই বা আসে যায়। তুমি চির যৌবনা, আমাদেরই সমবয়সী। যুবকদের কাছে তুমি চিরকাল সমাদর পাবে। আর তরুণীরা? তারা একই সঙ্গে তোমাকে হিংসা করবে আর ভালবাসবে।

তারপর মনে আছে তোমার, একদিন আমাকে আর ঠাকুমাকে তোমার দুইপাশে রেখে ফোটো তুললেন সলিলবাবু, নাম দিলেন তিন সুন্দরী। ভাবখানা এই ঠাকুরমা একদিন আমারই মত নতুন বউ হয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। লাল বেনারসীতে মোড়া লাল টুকটুকে বউ। কিন্তু সে কথা এখন কারই বা বা মনে আছে। এখন তাঁর সব সাদা, সাদা চুল, চোখে নিকেলের সাদা ফ্রেমের চশমা। পরণে সাদা থান-অন্য রং যা আছে, তা তাঁর স্মৃতিতে। আর একপাশে আমি। তাঁর যৌবন স্মৃতি। সলিলবাবু আমাকে সেদিন রাঙা শাড়ী পড়তে বলেছিলেন। আমার দিদি শাশুড়ী একদিন আমার মতই ছিলেন। আবার আমিও একদিন ওঁরই মত বুড়ী হব। কিন্তু মধ্যবর্তিনী তুমি ভেনাস, তুমি অনন্ত যৌবনা, তুমি নহ-মাতা, নহ-কন্যা, নহ-বধূ, নহ-দিদিশাশুড়ী, নহ-তাঁর নাত্নি-নাতবউ। তুমিও মেয়ে, আমিও মেয়ে। কিন্তু একেবারে জাত আলাদা, তবু সলিলবাবু আমাকে তোমার নামে ডাকতে লাগলেন, দেখ কাণ্ড। ঠাট্টারও একটা সীমা

আছে, অবশ্য একটু একটু যে ভালো লাগেনা, তাও নয়, বন্ধুদের কাছ থেকে এক একটা নতুন নতুন নাম উপহার পেতে কার না ভাল লাগে? একটা নতুন নাম যেন একটা নতুন জন্ম, যেন একটা নতুন মেয়ে। একটি নতুন নামের মধ্যে সেই পুরানো নামের আমিই আছি। অথচ পুরোপুরি নেই।

আমি সলিলবাবুকে বললাম 'আ হা হা আমি ভেনাসের মত কিনা। আমি যদি সত্যি সত্যিই ভেনাসের মত হ'তাম, তাহলে আপনি আর আপনার বন্ধু আমার নাগাল পেতেন নাকি? আমি থাকতাম উঁচু বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে। আর আপনারা বেদীর নীচে হাঁটুগেড়ে বসে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা করতেন।'

সলিলবাবু হেসে বললেন, 'শুভেন্দুর তপস্যাব ফাঁড়া এখনও কাটেনি। জন্মান্তর না হোক এক জন্মের তপস্যার দায়িত্ব নিতেই হবে।'

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম, আমার স্বামী বললেন, 'চট ক'রে দু-কাপ চা ক'রে আনতো বুলা।'

ঠিক সেই মুহূর্তে চা করতে যাওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। বেলা বারোটা বাজে বাজে। অসময়ে চা করতে দেখলে কি কাউকে খেতে দেখলে মা রাগ করেন। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, আমি যদি তোমার মত একটি মূর্ত্তি হতাম বেশ হত। কাউকে খুশী করবার জন্যে আমাকে এই ভরদুপুরে চা করতে যেতে হ'ত না, আবার কেউ পাছে অখুশী হন, সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেও হত না। আমি চা করতে গেলাম বটে, কিন্তু আমার সেই সামান্য অনিচ্ছা, আমার পিছনে যেন এক বিরাট মর্মরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর একদিন। আমার সেদিন দারুণ মাথা ধরেছে। কিন্তু স্বামী আর তার বন্ধুদের সঙ্গে বেরোতেই হবে। স্বামী আমাকে চুপে চুপে বললেন, ওরা অনেক আশা করে এসেছে। না গেলে ভালো দেখায়

না। বাইরের হাওয়া লাগলেই তোমার মাথা ধরা সেরে যাবে। না হয় একটা অ্যাসপ্রো ট্যাসপ্রো খেয়ে নিলেই হবে।

আমি আধখানা ইচ্ছা নিয়ে গেলাম আর আধখানা ইচ্ছাকে আমি মর্মরময়ী ক'রে রেখে গেলাম।

তুমি বেশ আছো ভেনাস। কারো মন জোগাবার দায়িত্ব তোমার নেই। তুমি আছ ব'লে সবাই খুশী।

ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই একই চোখে দেখে। চেয়ে দেখে তোমার রূপ। রূপই তোমার একমাত্র গুণ। আমাকে যেমন সাজতেও হয়, তেমনি কাজও করতে হয়। অবশ্য বড় কোন কাজের ভার এখনো আমি পাইনি। সবই ছোট ছোট কাজ। চা করা, বিছানা পাতা, ঘর সাজানো, টেবিলে গুছানো সবই সখের কাজ। তবু কাজ তো, কখন কোন্ খুঁত বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক কি। তাছাড়া কতজনের কতরকম ইচ্ছা। শ্বশুরের সাধ আমি গান শিখি। তাঁর ছেলের ইচ্ছা আমি আরও পড়াশুনা করি। শাশুড়ীর ইচ্ছা ঘর সংসারের কাজে আরও পাকা হই। তাই নাকি মেয়েদের আসল গুণ। ভেনাস তোমার কাছে কারও কোন প্রত্যাশা নেই। এমনকি ভালোবাসার বদলে যে ভালবাসা, তাও তোমার কাছে কেউ আশা করে না। তোমার শিল্পী তোমাকে যেমন করে গড়ে রেখেছেন, তুমি তেমনি রয়েছ। একটুও নড়ে চড়ে বসোনি। এদিকে জন্মের পর থেকে আমার মধ্যে যে কত ভাঙা গড়া চলছে, আরও কত চলবে তার ঠিক কি। তুমি শুধু যুগ যুগ ধরে পেয়েই যাচ্ছ। দেওয়ার নাম নেই। আমাকে পেতেও হয়, দিতেও হয়। শুধু পেয়ে কী সুখ আছে, তুমিই জানো। না দিতে পারলে পাওয়া তো আধখানা পাওয়া।

এর মধ্যে মাসখানেকের জন্য বাবা-মার কাছ থেকে ঘুরে এলাম। এল আই সি অফিসার। বিয়ের আগে ছিলেন দুর্গাপুর, বিয়ের পর বদলি হয়েছেন কাঁথিতে। বাবার বদলির চাকরির জন্যে এর আগেও

আমাদের কতবার বাসাবদল করতে হয়েছে। কিন্তু এবারের মত এত অদলবদল কোনবারই হয় নি।

আমি বললাম, 'বাবা, তুমি আমাকে পর ক'রে দিয়েছ। ভাল ক'রে কথাই বলছ না।'

বাবা হেসে বললেন, 'তুইও তো কত বদলে গেছিস্। আমাদের ছেড়েটেড়ে দিব্যি তো আছিস্।'

তা আছি। অথচ বিয়ে যেদিন হ'ল সেদিন কী কান্না! যেদিন চলে আসি বাবা-মা, আমি আর আমার বোন চারজনে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলাম। সে যে কী দুঃখ। তোমার যদি বোধ শক্তি থাকত ভেনাস, তুমি ফেটে চৌচির হয়ে যেতে, ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে পড়তে। সেদিন ভাবতে পারিনি, মা আর ঝুলাকে ছেড়ে একদিনও কোথাও গিয়ে থাকতে পারব। কিন্তু পারলাম তো। মানুষকে কত কী-ই না পারতে হয়। সে নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যায়, কত কী-ই না সে পারে। কিন্তু ভেনাস; মুগ্ধ করা ছাড়া তোমার আর কোন্ গুণটা আছে শুনি?

গুণ যেমন নেই তেমন দোষও নেই। আমি যখন দেখলাম আমার ছোট বোন ঝুলা আমার সব জিনিষ পত্র দখল ক'রে বসে আছে, বাবা মার উপর ওর এখন একচ্ছত্র আধিপত্য, আমার কী হিংসেটাই না হ'ল। আর বাবা-মার মুখে ওর সুখ্যাতি আর ধরে না। আমি যা-যা করতাম, সব এখন ঝুলা করে দেয়। আগে কী কুঁড়েই না ছিল।

আমি বললাম, 'ঝুলা এ কী কাণ্ড। আমি যেতে না যেতেই বাবা-মার সবখানি জুড়ে বসেছিস্।'

ঝুলা বলল, 'হিংসুটে। তুই যে কত পেলি। কত গয়নাগাটি, আর রাশ রাশ জিনিস পত্তর তাতেও তোর আশা মিটল না। আর তোর তো এখন ডবল বাবা, ডবল মা, সব ডবল ডবল।'

নিজের অজান্তে আমি শুধু দ্বিগুণই হই নি, কত গুণ যে বেড়েছি, এক আমি যে কত আমি হয়েছি, তা ঝুলাকে আমি কি করে বুঝোই।

কলকাতায় ফিরে এলাম। দেখি স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে আর সবাই আসছেন কেবল সলিলবাবু—আর আসেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে সলিলবাবুর ?'

স্বামী হেসে বললেন, 'কি আবার হবে ? আন্দামানে বদলি হয়েছে।'

শুনেছিলাম পি ডবলিউ ডি তে কাজ করেন। কিন্তু ওর যে বদলির চাকরি আমার সে খেয়াল ছিল না। আমি ধরে নিয়েছিলাম, তিনি শুধু ফটো তোলেন আর কথা বলেন। আমি ভেবেছিলাম এই মৌখিক ফটোগ্রাফারের সারা জীবনটাই সখের জীবন। ওঁর যে কাজকর্ম আছে তা আমার ধাবণা ছিল না খোঁজ খবরও নিইনি।

ইদানীং তুমি তাকে পেয়ে বসেছিলে ভেনাস। গ্রীসের অ্যফ্রে'ডিটের সঙ্গে কী করে তুমি মিশে গেছ দেশীয় কোন দেবীর সঙ্গে তোমার তুলনা, রতির সঙ্গে কতখানি মিল, রাধার সঙ্গেই বা কতখানি, কতখানি উর্ব্বশীর সঙ্গে, এই নিয়েই তাঁর গবেষণা চলত। তাছাড়া তোমাকে ঘিরে যত কিংবদন্তী আছে, যত পৌরাণিক উপাখ্যান তার কোন কিছুই যেন তিনি আমাকে না শুনিয়ে ছাড়বেন না। শুনতে শুনতে আমার স্বামীর মাথা ত' ধরতই আমার মাথাও ঝিম ঝিম করত।

আমার স্বামী একদিন বলেছিলেন, 'সলিল, ঐ রতিই একদিন তোমার ভীমরতি ধরিয়ে ছাড়বে। ভেনাসের আরও একটা মানে আছে শুক্র গ্রহ। চল, আমরা সেখানে দিন কতক ঘুরে আসি।'

দিন দুই একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগল, কিন্তু তার বেশী নয়। ভেনাস

যে নিজের বাবা, মাকে ছেড়ে আসতে পারে সে না পারে কী। তাছাড়া আমার স্বামীর বন্ধুবান্ধবের কি অন্ত আছে? আর সকলেই হৈ হুল্লোড় ভালবাসে।

তারপর সেদিন হঠাৎ আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম ভেনাস, কেন দেখলাম তা জানিনে। তোমার এই ছোট্ট একফোঁটা মাটির মূর্তি নয়, বিরাট এক মার্বেলের মূর্তি। এক নিঃসঙ্গ নির্জন দ্বীপের মধ্যে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউ তোমাব পায়ে আছড়ে পড়ছে। তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভ্রূক্ষেপ নেই? নাকি তোমার হৃদয়ে ওই নীল সমুদ্রের মতই তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু বলতে পারছনা। প্রকাশের ভাষা নেই তোমার। এমন কি ইশারা ইঙ্গিত টুকুও অজানা।

আমার সুখ-দুখের ভাগীদার তুমি ত' নও ভেনাস, কিন্তু তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল, হঠাৎ মনে হ'ল তোমাব বুক আর আমার বুক আলাদা নয়, তোমার অঙ্গ আব আমাব অঙ্গ আলাদা নয়, তোমার অন্তর আর আমার অন্তর এক।

এ কী বিড়ম্বনা।

জেগে ওঠে স্বামীকে সব বললাম।

তিনি হেসে বললেন, 'আমার ঠাকুরমাকে স্বপ্নের মধ্যে শিংওয়ালা ষাঁড় তাড়া করে। আর তিনি ভয়ে কাতরাতে থাকেন। তোমাকে বড় জোর অ্যাপোলো তাড়া করতে পাবত। ভেনাস কেন?'

আর একদিন স্বপ্ন দেখলাম। আরও একদিন।

স্বামী বললেন, এককাজ কর, ঐ অপয়া ভেনাসটা কাউকে দিয়ে দাও। ওরই এসোসিয়েশনে ঐ সব দুঃস্বপ্ন। ওকে চোখের সামনে রেখে দরকার নেই।

বললাম, কাকে দেব।

তিনি বললেন, 'যাকে খুশি। ওই মাটির ভেনাসটা তুমি যাকে ইচ্ছা দিতে পারো কিন্তু রক্ত মাংসের হৃদয় মনের ভেনাসকে আমার একান্তভাবে চাই।' তিনি এই বলে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। কাকে আর তোমাকে দিতে যাব ভেনাস? তার চেয়ে তুমি আমার কাছেই লুকিয়ে থাক। আমার ঘরে, আমার মধ্যে।

বিষাদযোগ

বাসষ্টপ থেকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। খোয়া ছড়ানো রাস্তা। পথ মোটেই মসৃণ নয়। দুদিকে ছোট ছোট বাড়ি। টালিতে ছাওয়া, কোন কোন ঘরের ওপরে করোগেটেড টিনের চাল, পাকা বাড়িও আছে মাঝে মাঝে। আছে সেই মোষের খাটাল আর কচুরিপানায় ঢাকা ছোট বড় দু'তিনটি পুকুর। এগুতে এগুতে শুভেন্দু ভাবল বিজনদের শহীদনগরের টপোগ্রাফির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। কলোনীটি পাঁচ ছয় বছর আগেও যা ছিল এখনো প্রায় তেমনি আছে।

বিজুদের বাড়ি অবশ্য পাকাই। একতলায় খান তিনেক ঘর। সামনে উঠোন আছে। পশ্চিমদিকে শাকশবজী ফুলফলের বাগান। দেয়াল ঘেঁসে যে বেলের চারাটিকে উঠতে দেখে গিয়েছিল শুভেন্দু, তা এখন ডালপালায় ছড়ানো ফলন্ত বৃক্ষ। সবুজ সুগোল ফলগুলির দিকে শুভেন্দু মুগ্ধ চোখে তাকাল। বেল অবশ্য সে খেতে ভালোবাসে না। ক্বচিৎ কখনো খায়। বিজনের বাবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বার মাস বেল খেতেন তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। বাজার থেকেই কিনতেন অবশ্য। তখন নিজেদের বাড়িতে বেলের গাছ ছিল না। গতবার এসে তাঁকে আর দেখতে পায়নি শুভেন্দু। তিনি দেহরক্ষা করেছেন। মেসোমশাই শুভেন্দুকে খুব ভালোবাসতেন।

সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু কড়া নাড়ল। কে জানে বিজন বাড়িতে আছে কি নেই। ও যা সভাসমিতি মিছিলটিছিল করে বেড়ায় তাতে এই রবিবারের বিকালে বাড়িতে না থাকবারই কথা। শুভেন্দু আগে খবর দিয়ে আসেনি।

কিন্তু ভাগ্য ভালো, দেখা হয়ে গেল। বিজন নিজেই এসে দোর খুলে সামনে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'আরে তুমি! কবে এলে রায়পুর থেকে।'

শুভেন্দু বলল, 'পরশু।'

বিজনদের কলোনীরও কোন পরিবর্তন হয়নি, ওর নিজের শরীরও তেমনি বিশেষ কিছু বদলায় নি। শুভেন্দুর মনে হয় কলেজে পড়বার সময় বিজুর যে চেহারা ছিল এই দশ দশ বছর বাদে আজও যেন তেমনি আছে। ছোটখাটো শরীর। পাঁচ ফুটের ওপর বড়জোর ইঞ্চি দেড়েক হবে দৈর্ঘ্যে, কিন্তু রোগা বলে ওকে বেঁটে মনে হয় না। বাইশ তেইশ বছরের পর ওর বয়স যেন আর বাড়েনি। মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্ন সামান্য। ও যেন আজও পূর্ণ যৌবনে পৌঁছায় নি। এই ক্ষীণ দুর্বল অপুষ্ট শরীর নিয়ে ও কী করে এত পরিশ্রম করে, অফিসে কাজ করে, বাকি সময় যায় রাজনীতিতে। ওর মনের জোর আছে বলতে হবে। ওর সঙ্গে সর্বদা যে মতের মিল হয় শুভেন্দুর তা নয় কিন্তু বন্ধুর মানসিক দৃঢ়তাকে সে সব সময় শ্রদ্ধা করে।

বাইরের বসবার ঘরটিতে সামান্য কিছু আসবাবপত্র। একখানি তক্তাপোষ, খানকয়েক হাতলহীন চেয়ার, একটি আলমারিতে কিছু বই পত্রপত্রিকা। অল্পবয়সী গুটি তিনেক ছেলে বোধ হয় বিজনের জন্যেই অপেক্ষা করছে। বিজু তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে কি যেন উপদেশ নির্দেশ দিল। তারপর ওদের বিদায় দিয়ে ফের এসে বসল বন্ধুর সামনে।

শুভেন্দু হেসে বলল, 'কী ব্যাপার, বাইরের লোককে বুঝি বলা যায় না? বিজনও মৃদু হাসল, 'বলে লাভ কি বলো? তার চেয়ে বল সুমিতা কেমন আছে? ছেলের বয়স বোধহয় বছর দুই হ'ল তাই না? কী যেন নাম রেখেছ?'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'তুমি মনে রাখতে পারবে না। তোমার

ধারণা নিজের স্ত্রীপুত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে আমার ইনটারেসট নেই।'

বিজন স্মিত মুখে বলল, 'ওসব কথা তুলে কি লাভ, দেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ যেমন নিজের বউ ছেলে নিয়ে এক একটি করে ছুনিয়া গড়ে তুলেছে তুমিও তাই। তোমার তো লজ্জার কিছু নেই।'

শুভেন্দু বন্ধুর দিকে তাকাল, তারপর হেসে বলল, 'আর তোমার নিজের বউ ছেলে হয়নি বলেই কোটি কোটি পরের বউ আর তাদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের ভাবনা তুমি কাঁধে নিয়ে বসে আছ। তোমার ওপর তিন ভুবনের ভার।'

বিজন বলল, 'তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই শুভেন্দু। একটু বসো। মাকে শিখাকে খবর দিই। নাকি তুমি যাবে ভিতরে?'

শুভেন্দুর কেমন যেন মনে হল তাকে চট করে ভিতরে নিয়ে যেতে যেন বিজন অনিচ্ছুক। এও কি মন্ত্রগুপ্তি না পারিবারিক প্রাইভেসি রক্ষা? কিন্তু কলেজে সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে বিজনের সঙ্গে শুভেন্দুর বন্ধুত্ব। ভিতরে নিয়ে যেতে ওর এত অনিচ্ছা এর আগে শুভেন্দু দেখেনি। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হল শুভেন্দু। বলল, 'না না না, ভিতরে গিয়ে আর কি হবে? মাসীমাকে খবর দাও। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। আবার কবে আসা হবে। আর শিখা—'

বিজন একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'শিখার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ও শুয়ে আছে।'

শিখা বিজনের ছোট বোন। ওর সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানোটা মোটেই অসঙ্গত মনে হয় না শুভেন্দুর। শিখাকে ফ্রক পরতে দেখেছে শুভেন্দু। যখন এক পাড়ায় পাশাপাশি ভাড়াটে বাড়িতে থাকত খুবই যাতায়াত ছিল, ছুই পরিবারে খুবই হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওর ছুই দিদি রেখা ও লেখার সঙ্গে শিখাও আসত শুভেন্দুদের বাড়িতে। ওর দিদিরা মোটামোটা উপন্যাস চেয়ে নিত। দিদিদের

সঙ্গে ওর ছিল রেষারেষি। ও বলত, 'শুভদা, আমাকে গল্পের বই দেবেন না?'

'কিসের গল্প? ভূতের না রাক্ষসের?'.

গায়ের রঙ কালো শিখার। কিন্তু মুখশ্রী ভারি সুন্দর। টানা নাক। চোখ দুটি উজ্জ্বল। দেখলেই মনে হয় বেশ বুদ্ধিমতী। ওর দিদিদের বিয়ে হয়ে গেল। একজন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ছিল আর একজন পেরোতে পারেনি। বিজুই চেষ্টা চরিত্র করে ওদের বিয়ে দিয়েছে। শিখা বি-এ পাশ করে স্কুলে মাষ্টারি করে। শুভেন্দু শুনেছিল ওরও বিয়ের সম্বন্ধটম্বন্ধ দেখা চলছে। শুভেন্দুর বউভাতে বিজু শিখাকে নিয়ে গিয়েছিল নিমন্ত্রণ রাখতে। বিজুর চেহারা বদলায়নি, কিন্তু শিখা অনেক বদলে গেছে। আরো লম্বা হয়েছে, আরো সুশ্রী। এ যেন শুধু দেহের যৌবনশ্রীই নয় সেই সঙ্গে আরো কিছু আছে।

শুভেন্দু হেসে বলেছিল, 'এ যে একেবারে লেডি হয়ে গেছিস। এত বড় হলি কবে?'

শিখা বলেছিল, 'কী জানি, ক্যালেণ্ডার তো দেখিনি। বউদি কিন্তু বড় সুন্দর হয়েছে।' শুভেন্দু বলেছিল, 'তাই নাকি? আমার তো মনে হচ্ছিল তোর বউদিকে যত লোক দেখেছে তার চেয়ে বেশি তোকে দেখেছে।'

শিখা লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যান।' তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, 'আপনি বড্ড ফাজিল হয়ে গেছেন। বিয়ে করলে মানুষ বুঝি এই রকম হয়?'

সেই মধুর লজ্জা আর মধুরতর অনুযোগটুকু ভারি ভালো লেগেছিল শুভেন্দুর। তারপর বছর তিনেকের মধ্যে ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ওকে একটু দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল শুভেন্দুর। কিন্তু যে মেয়ে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে তাকে তো আর দেখতে যাওয়া যায় না। বিশেষ করে বিজুর যখন এত অনিচ্ছা।

ভিতরের ঘর থেকে বিজুর মা বেরিয়ে এলেন, 'এই যে শুভেন্দু। কবে এসেছ?'

মাসীমার চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে। পরনে সরু কালো পাড়ের সাদা খোলের আধময়লা শাড়ি। মুখে ম্লান হাসি। এই মহিলাটির কাছে কত স্নেহই না ছেলেবেলায় পেয়েছে—শুভেন্দুর মনে পড়ল।

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল শুভেন্দু। 'কেমন আছেন মাসীমা?'

বিজুর মা একটু হেসে বললেন, 'আর বাবা, আমাদের আর থাকাথাকি। দেখতেই তো পাচ্ছ দিনকালের অবস্থা।'

শুভেন্দু বলল, 'সত্যি মাসীমা কলকাতায় এসে দেখছি না এলেই ভাল হত। বোমা-বারুদ গুলি-গোলা লেগেই আছে। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়ার জো নেই। কখন কোথায় কি বিভ্রাট ঘটে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে কলকাতা যেন এক পাগলের দুঃস্বপ্ন।'

বিজন সামনেব চেয়ারটায় বসেছিল। বন্ধুর কথা শুনে ফোঁস করে উঠল, 'স্বপ্ন নয় শুভেন্দু, কঠোর বাস্তব। বলতে পার ভয়ঙ্কর বাস্তব। কাল যবে জাগে তাকে সভয়ে অকাল কহে সবে। বহুদিনের অবিচার অব্যবস্থা গলদ আর গ্লানি জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে।'

শুভেন্দু বলল, 'সেই পাহাড় বুঝি এখন আগ্নেয়গিরি?'

মাসীমা বললেন, 'থাক বাবা ওসব তর্ক। দিনরাত তো এইসব নিয়েই আছি। আর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ভাবি দুদিন কোথাও গিয়ে ঘুরে আসি।'

শুভেন্দু বললে, 'চলুন না মাসীমা আমাদের রায়পুরে। আমাদের কোয়ার্টারে থাকবেন। বেশ ফাঁকা জায়গা। কোথাও কোন গোলমাল নেই। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

মাসীমা বললেন, 'ছেলের কাছে আবার অসুবিধে কিসের। তুমি সেখানে ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি কর। বউমা আছে। আমার কি কোন থাকার অভাব হবে? সেজন্যে নয়।'

'তবে?'

মাসীমা বললেন, 'আমার দুটি পাগল ছেলে মেয়েকে ফেলে কোথায় যাব বাবা? বউমা আর বাচ্চাটি ভাল আছে তো? ওদের কতদিন দেখিনে।'

শুভেন্দু বলল, 'ওরা গড়িয়াহাট পর্যন্ত এসেছে। সুমিতার কাকা আছে সেখানে। দেখা করে যাবে। একবার ভেবেছিলাম নিয়ে আসব। কিন্তু—'

মাসীমা বললেন, 'না বাবা, না নিয়ে এসে ভালোই করেছ। ভাগ্যে যদি থাকে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ হবেই। তোমার আসাটাও আমার ভাল লাগছে না। চা-টা খেয়ে তুমি বরং সন্ধ্যার আগেই চলে যাও। যাই, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।'

বিজু বলল, 'মা বড্ড প্যানিকি।'

বিজুর মা ফিরে তাকালেন, 'প্যানিকি! যা দেখলাম তার পরেও যে বেঁচে আছি—'

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে বিজু?'

বিজু বলল, 'কিছু না।'

তারপর আর কিছু না বলে গম্ভীরভাবে চুপ করে রইল।

লম্বা চওড়া চেহারা নিয়েও এই ছোটখাট মানুষটির কাছে মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বলে মনে হয় শুভেন্দুর। কলেজে সে পড়াশুনায় বিজুর চেয়ে ভালো ছিল, রেজাল্টও খারাপ করেনি। ভালো চাকরিও পেয়েছে। বাবা মা স্ত্রী পুত্র নিয়ে মোটামুটি সুখেই আছে শুভেন্দু। সেই তুলনায় শুরু থেকেই সংগ্রামের জীবন বিজনের। অসচ্ছল পরিবারে মানুষ। বাবা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সামান্য মাইনের

কাজ করতেন। টিউশনি করে পড়ত বিজু। তা সত্ত্বেও রেজাল্ট ভালো করত। 'তখন থেকেই শুভেন্দুর মনে হত তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও বিজু আলাদা।' ও আড্ডা দেয় না, সিগারেট খায় না, কচিৎ কখনো সিনেমা দেখে। যেটুকু সময় পায় পড়াশোনা করে। আর বসে বসে ভাবে। চোখের সামনে ও যেন কিছু একটা দেখে। নিজের কল্পনার পৃথিবীকে। শুভেন্দু ভেবেছিল ও বুঝি কবিতা লিখবে। কিন্তু তা লিখল না। ও পদ্য লিখল না গল্প লিখল না। সায়ান্সের ছেলে, অথচ সেই বিজ্ঞান চর্চাও ও ছেড়ে দিল। ও নিজের পাড়ায় স্কুল গড়ল, যুব সমিতি গড়ে তুলল। সমাজের যে-স্তরের মানুষকে শুভেন্দু দূর থেকে.দেখে বিজু তাদের ভিতরে চলে গেল !

শুভেন্দু একদিন বলেছিল, 'বিজু, ম্যাথেম্যাটিকসে তোমার মত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে আমাদেব মধ্যে আর কেউ ছিল না। তুমি তোমার সাবজেকট নিয়ে থাকলেই বোধহয় ভালো করতে।'

বিজন মৃদু হেসে বলেছিল, 'আমি তো আমার সাবজেকট নিয়েই আছি।'

শুভেন্দু ভাবত গণিত নয়, অগণিতের ভাবনা ওর মনে। সেই ভাবনা ভাবতে গিয়ে ও পারিবারিক দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। বাবাকে সাহায্য করেছে, বোনদের সাধ্যমত লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছে। অমন বিপ্লবীও কতকগুলি পুরোন মূল্যবোধকে স্বীকার করে নিয়েছে। শুভেন্দুর একাধিক বন্ধু জীবনে সফল হয়েছে। কেউ বড় ব্যবসায়ী, কেউ বড় চাকুরে, কেউ বা গেছে লেখালেখির দিকে। কেউ বা শুধু একটি সুন্দরী নারীর ভালোবাসা পেয়েই খুশি হয়েছে। বিজু তাদের কারো মত হয়নি, ও প্রেম চায়নি, যশ চায়নি, অর্থ চায়নি। দলের মধ্যেও ও বোধহয় প্রথম কেউ নয়। তা হলে কাগজে ওর নাম ছাপা হত।

শুভেন্দু শ্রদ্ধা করে বিজনকে। যে শুধু নিজের জন্যে ভাবে না,

দশজনের জন্যে ভাবে, দশজনের কিছু না কিছু করে আরো দশজনের শ্রদ্ধা সে পাবেই। কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দিতে শুভেন্দু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়? সত্যিই কি তাই? সত্যি কি রাজনৈতিক কর্মী আর নেতা মাত্রেই অতিমানব? বহুমানবের সুখ দুঃখে তাঁদের হৃদয় আন্দোলিত? রাজনৈতিক চৈতন্যই একমাত্র চৈতন্য? রাজনৈতিক কর্ম মাত্রেই একমাত্র কর্ম? না কি লোকের আরো পাঁচটি কর্মপ্রবণতার মধ্যে এও একটি? বিজন মুখে খুব বিনয়ী। মনে মনে কিন্তু ওর প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে, 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'। সব দলেরই তো ওই একই বাণী, একই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ছাড়া বোধহয় কাজ করা চলে না। এই অহঙ্কার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার ভিতরে ভিতরে মারেও।

মাসীমা তাদের দুজনের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এলেন। বিস্কুট আর দুটি করে সন্দেশ।

শুভেন্দু বলল, 'আবার এসব কেন মাসীমা?'

মাসীমা বললেন, 'খাও না বাবা, সবই আমার ঘরের তৈরি।'

শুভেন্দু বলল, 'বিজু কি একটা বিস্কুটের কারখানাও বসিয়েছে নাকি?'

মাসীমা হাসলেন, 'আমার কি আর সেই ভাগ্য বাবা? তোমার বন্ধুর কাণ্ডকারখানা অন্য রকম।'

শুভেন্দু আবার শিখার কথা তুলল, 'ওর কি অসুখ মাসীমা? উঠে এসে একবার দেখাই করতে পারল না। কবে আবার আসব তার তো ঠিক নেই। বলুন না ওকে।'

মাসীমা বললেন, 'কী আর বলব বাবা। ওর মন বড্ড খারাপ। ঘরের বাইরে ওকে আনা যায় না। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। চুপচাপ পড়ে আছে।

শুভেন্দু বলল, 'কী হয়েছে মাসীমা?'

তিনি ছেলের দিকে তাকালেন।

বিজু বলল, 'তুমি ভিতরে যাও মা। আমি শুভকে সব বুঝিয়ে বলছি।'

মাসীমা আর কথা না বলে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

বিজন কোনদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। আজও সংক্ষেপে শুভেন্দুর কৌতূহল নিবৃত্ত করল।

'খুব একটা দুঃখের ব্যাপার ঘটে গেছে ভাই। শিখা একটি ছেলেকে ভালবাসত। খুব ব্রাইট বয়। হঠাৎ গোলমালের মধ্যে পড়ে মারা গেল। হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। বাঁচানো যায় নি।'

শুভেন্দু চুপ করে রইল। কখনো যে সূর্য অস্ত গেছে, ঘরের মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে কারোরই খেয়াল নেই। শুধু ঘর নয় সারা বাড়ি, সারা কলোনিটা জুড়ে যেন অন্ধকারের রাজত্ব। দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ানো সেই বেলের গাছটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা অপার্থিব ভুতুড়ে একটা কিছু কাঠামো, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাধবীলতার গাছটাকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। ফুলগুলি অদৃশ্য।

শুভেন্দু উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অন্ধকার হয়ে গেল বিজু। এবার চলি।'

বিজন বলল, 'দাঁড়াও আগে সন্ধ্যা-দীপ জ্বেলে দিই।'

সুইচ টিপে আলো জ্বালল বিজন।

শুভেন্দু বলল, 'তোমাদের এই কলোনীতে তো ইলেকট্রিক লাইট ছিল না।'

বিজু একটু হেসে বলল, 'চেষ্টা-চরিত্র করে আনতে হয়। সবই কি আর আপনা থেকে আসে ? চল তোমাকে বড় রাস্তার মোড়ে বাস ষ্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

শুভেন্দু বলল, 'কেন আবার অত কষ্ট করবে?'

হঠাৎ ভিতরের দরজা ঠেলে শিখা বাইরের ঘরে চলে এল, তারপর শুভেন্দুর প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন শুভেন্দুদা আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

বিজন বোনের দিকে তাকাল, 'তুই যাবি?'

শিখা মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, আমিই যাই।'

মাসীমাও পিছনে পিছনে এসেছিলেন।

তিনি বললেন, 'বেরোবিই যদি শাড়ীটা বদলে যা। আয় তোর চুলটা বেঁধে দিই।'

শিখা বলল, 'না মা, ওসব কোন দরকার নেই।'

আটপৌবে শাড়িখানা পরেই শিখা শুভেন্দুব সঙ্গে সঙ্গে চলল। পিঠ ভরে চুলের রাশ ছড়ানো। কতদিন যে চুলের যত্ন নেয় না কে জানে।

ছুদিকে সারি সারি বাড়ি। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। কোন কোন বাড়ি থেকে রান্নার গন্ধ আসছে। কোথাও বা শিশুদের কলরব। কিন্তু শুভেন্দুর সঙ্গে যে তরুণী মেয়েটি চলেছে সে যেন এই লোকালয়ের কেউ নয়। আর একটি লোকান্তরিতের সঙ্গে সে কি অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশে আছে? সে কি শুভেন্দুকে কোন কথা বলবে না? যদি নাই বলবে তবে সঙ্গে এল কেন?

বড় রাস্তার কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ শিখা কথা বলল, 'শুভেন্দুদা।'

'কি শিখা।'

'আমরা কেউ আর কাউকে বিশ্বাস করিনে। আমরা পাশাপাশি ঘরে থাকি। এক ঘরে দাদা আর এক ঘরে আমি আর মা। মা করে কি জানো? আমার হাতখানা তার হাতের মুঠিতে ধরে রাখে। সেই ছেলেবেলার মত আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়।'

শুভেন্দু বলল, 'কী যে বল। মাসীমা তোমাকে কত ভালবাসেন।'

শিখা বলল, 'ভালোবাসে কিন্তু বিশ্বাস করে না।'

শুভেন্দু কী যে বলবে ভেবে পেল না। এক অসহায় অনির্দেশ্য বিষাদ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শোকার্তার পিঠে হাতখানা রেখে শুভেন্দু বাস ধরবার জন্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।

মুখোশ

'এবারকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশনে গিয়েছিলেন কল্যাণদা ?'

শিল্পরসিক বন্ধু অসিত গুপ্তের ফ্ল্যাটে বসে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় গল্প করছিলাম। অসিত আর জয়া দুজনেরই গল্পে সাহিত্যে বেশ অনুরাগ। জয়া নিজেও ছবি আঁকে, বাটিকের কাজ করে। অসিতের আছে অল্প-স্বল্প সঙ্গীতচর্চা। সব চেয়ে সুন্দর ওদের গৃহসজ্জা। ওরা দুখানি ঘরের এই ফ্ল্যাটটিকে ভারি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই কিন্তু জানলার পর্দা, চেয়ারের কুশন, বইয়ের র‍্যাক, আলমারি সব কিছুর মধ্যেই একটি পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় আছে।

আমি বললাম 'না। আর্ট একজিবিশনে গিয়েছিলাম। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালে আর যাওয়া হয়নি। বাইরের একজিবিশনের কী দরকার। তোমাদের এখানে এলে মনে হয় একটি কলাক্ষেত্রে এসেছি। ভালোবেসে বিয়ে অনেকেই করে কিন্তু ভালোবেসে এমন করে বসবাস করতে পারে কজনে ?'

দুজনেই লজ্জিত হল।

অসিত বলল, 'কী যে বলেন।'

জয়া বলল, 'আপনার সব বাড়াবাড়ি।'

ওদের লজ্জাটুকু উপভোগ করলাম। বয়সে যদিও ওরা এখন আর তরুণ-তরুণী নয়। অসিতের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। জয়াও মধ্য-তিরিশে। দেখলে অবশ্য তা মনে হয় না। দুজনেই যৌবনের রূপ-

লাবণ্য আর অন্তরের প্রসন্নতা জানি না কোন মন্ত্র বলে আয়ত্তে রেখেছে।

অসিত আবার সেই একজিবিশনের কথায় ফিরে গেল।

'এবারকার মেলা থেকে জয়া কিছু পর্দার কাপড় আর শাড়ি কিনেছে। আমি কি কিনেছি জানেন?'

হেসে বললাম 'কী কিনেছ?'

'একটা মুখোশ।'

'মুখোশ। কই দেখি।'

অসিত উঠে গিয়ে তাকের ওপর থেকে একটি মুখোশ নামিয়ে আনল। সুন্দর একটি দেবীপ্রতিমার মুখ। বিশালাক্ষী ত্রিনয়নী। অসিত নিজেই ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগল এই রমণীয় শিল্প বস্তুটির কারুকর্ম। পুরুলিয়ার কারিগরদের হাতের কাজ। কাগজের মণ্ডের ওপর তৈরি। ভারি হালকা।

'আরো অনেক সুন্দর সুন্দর মুখোশ উঠেছিল জানেন? হাতে টাকা ছিল না। থাকলে আরো কয়েকটা কিনে আনতাম।'

জয়া বলল, 'ভাগ্যিস ছিল না।'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'সত্যি অসিত তুমি বড় বেরসিকের কাজ করে ফেলেছ। মুখোশই যদি কিনবে একটা রাক্ষস খোক্কসের মুখোশ কিনলেই হত। যা এনেছ তার চেয়ে সুন্দর মুখ তো তোমার ঘরেই আছে।'

জয়া লজ্জিত হয়ে বলল 'আহা!' তারপর মুখ তুলে বলল, 'আপনি যা স্তবস্তুতি করতে পারেন কল্যাণদা তাতে এই মুখোশও কথা বলে উঠবে। বলবে, কী বর চাও।'

অসিত বলল, 'ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এ একেবারে দেবীর মুখ। এখানকার কুমোররা যে দেবীমূর্তি গড়ে তাতে দেবত্ব কম। এই ধরনের মূর্তি গড়ত আমাদের গাঁয়ের কুমোররা। ছেলেবেলায় দেখেছি।'

অসিত আরও কি বলতে যাচ্ছিল বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল।

অসিত তাড়াতাড়ি মুখোশটা সেণ্টার-টেবিলের ওপর রেখে দোরের কাছে এগিয়ে গেল। দোর খুলে নিয়ে বলল, 'আরে আসুন আসুন শ্রীমন্তদা। কী ভাগ্য। এবার কিন্তু আপনি অনেকদিন বাদে এলেন।'

একটু আগে অসিত আমাকেও ঠিক এইভাবেই অভ্যর্থনা করে ঘরে ডেকে নিয়েছিল।

এবার ওর পিছনে পিছনে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। কালো লম্বা ছিপছিপে চেহারা। ঠিক বয়স আন্দাজ করা শক্ত। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে। বেশবাসের ওপর তেমন যেন দৃষ্টি নেই। ধুতি পাঞ্জাবি আধময়লা। লম্বাটে ধরনের মুখ। একটু যেন বেশিই লম্বা। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে। ডান গালে খানিকটা পোড়া দাগের মত। একটু পরেই বুঝতে পারলাম ওটা জট। দাগটা প্রথম দৃষ্টিতে একটা অস্বস্তির অনুভতি জাগায়।

শ্রীমন্তবাবু আমার সামনের বেতের চেয়ারটায় বসলেন। তাঁকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জয়া তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'আবার তুমি উঠলে কেন, তুমিও বোসো।'

জয়া মৃদু হেসে বলল, 'বসছি শ্রীমন্তদা। আর একটা চেয়ার নিয়ে আসছি। তার আগে বলুন আপনি কী খাবেন। চা না কফি। আমরা তো এই মাত্র কফি খেলাম।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'আমি কোন ব্যাপারেই মনস্থির করতে পারি নে! আইদার অর দেখলে ঘাবড়ে যাই। যা দেবে দাও। কিছু না দিলেও ক্ষতি নেই।'

জয়া বলল 'সে কি কথা! আপনার কোন ক্ষতি নেই? কিন্তু কিছু না দিতে পারলে আমাদের—

শ্রীমন্তবাবু একটু হেসে বললেন 'অকল্যাণ ?'

জয়া বলল, 'অকল্যাণ টকল্যাণ নয়। *আপনি কিছু না খেলে* আমাদের খুব খারাপ লাগবে। আমরা দুঃখ পাব।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'তাহলে আনো। আমি স্বেচ্ছায় কাউকে দুঃখ দিতে চাইনে।'

জয়া এরপর স্মিতমুখে পাশের ঘরে চলে গেল।

শ্রীমন্তবাবু হঠাৎ অসিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দাওনি। আমার অবশ্য পরিচয় দেওয়ার মত কিছু নেই। কিন্তু ওঁর থাকতেও পারে। তোমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা তো প্রায়ই সব গণ্যমান্য—'

অসিত লজ্জিত হয়ে বলল 'ওহো আপনাদের ইনট্রোডিউস করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার পরেই মনে হ'ল। কল্যাণদা, ইনি হলেন শ্রীমন্তবাবু। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের সমঝদার। এক সময় নিজেও গাইতেন।

শ্রীমন্তবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব বাদ দাও। ওসব গত কালের কথা।'

অসিত আমারও যথারীতি পরিচয় দিল।

শ্রীমন্তবাবু বললেন, নমস্কার নমস্কার। এক সময় আপনার লেখাটেখা পড়েছি। তারপর বহুকাল লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বলতে পারেন কোন ব্যাপারের সঙ্গেই তেমন সম্পর্ক নেই। একেবারে নিঃসম্পর্ক। তবে সম্পর্ক রাখার বাসনাটুকু আছে। সেই হয়েছে জ্বালা। কিন্তু আপনাদের [illegible]াপ আলোচনায় বোধহয় বাধা দিলাম। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনাদের।'

হেসে বললাম, 'ওতো কিছু গুরুতর বিষয় নয়। অসিত একটা মুখোশ কিনেছে! তাই দেখছিলাম!'

শ্রীমন্তবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন 'মুখোশ ? দেখি দেখি।'

টেবিলের ওপরই মুখোশটা ছিল। তিনি সাগ্রহে সেটা তুলে নিয়ে চেয়ে দেখে বললেন, 'বাঃ বেশ। কিন্তু এতো মেয়েদের মুখোশ। একটা পুরুষের মুখোশ এনো তো আমার জন্যে। পুরুষের মত পুরুষ।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'বেশ তো আনব।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'হ্যাঁ এনো। মজা দেখেছ, মেয়েদের আমরা যতই ভালোবাসি, তাদের গয়নাগাটি আমরা পরতে চাইনে, তাদের সাজসজ্জা আমরা নিতে চাইনে। যদিও দাড়ি গোঁফ কামাই কিন্তু রুজ লিপস্টিক মাখিনে। আমরা তাদের পুরুষ হয়েই ভালোবাসি। মেয়েরাও তাই। কোন মেয়ে যত দীপ্তিময়ীই হোক তাকে যদি বল তোমার ঢংটা পুরুষালি সে রাগ করবে, দুঃখ পাবে।'

জয়া প্লেটে করে খাবার নিয়ে এল। ডিমের পোচ, বিস্কুট। সেই সঙ্গে কফি।

'আমাকে বাদ দিয়ে গল্প বলছেন শ্রীমন্তদা?'

শ্রীমন্তবাবু বললেন 'তাই কি হয়? তোমাকে বাদ দিয়ে কি গল্প জমে?'

তারপর খাবারের প্লেট আর কফির কাপ দুই-ই টেনে নিলেন। তাঁর খাওয়ার ধরন দেখে মনে হল মুখে লাজ থাকলেও তাঁর পেটে ক্ষিদে আছে।

জয়া তাঁর পাশে সুদৃশ্য একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। যেন ব্রতকথা শুনছে।

শ্রীমন্তবাবু তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'এবার গল্প জমবে। পেটে কিছু না পড়লে কি আর মুখে কথা ফোটে।'

জয়া বলল, 'শ্রীমন্তদা, আপনাকে আরো কিছু এনে দিই তাহলে।'

জয়া উঠতে যাচ্ছিল শ্রীমন্তবাবু হাত ধরে তাকে ফের বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্থির হয়ে বোসো। দরকার হলে চেয়ে নেব। আজকাল

আমি বুদ্ধদেব হয়ে গেছি। সুজাতাদের কাছে পরমান্ন ছাড়া আর কিছু চাইনে। বুদ্ধদেব অবশ্য না চাইতেই পেয়েছিলেন। সবাই কি তা পায়?'

জয়া আবদারের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি যা বলছিলেন তাই বলুন। আসল কথাটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'আসল কথা? একটি নকল মুখের কথাই তো হচ্ছিল। জানো ছেলেবেলা থেকেই মুখোশ আমাকে আকর্ষণ করত। একবার কালীপুজোর সময় আমাদের পাড়ার ছেলেরা মুখোশ পরে নেচেছিল। কিন্তু আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম। দূরে বসে নাচ দেখবার পারমিশন পেয়েছি, নাচবার পারমিশন পাইনি। তারপর বড় হয়ে মুখোশের গল্প পড়েছি। লোকে মুখোশ পরে ডাকাতি করে এই সব গল্প। রঙচঙে মুখোশ আমার মনে রোমান্টিক ভাবের উদ্রেগ করত। রোমিও জুলিয়েটের সাথে মুখোশ পরে দেখা করতে গিয়েছিল। জুলিয়েট যে জীবনে একেবারে আসেনি তা নয়, কিন্তু আমি বিনা মুখোশেই দেখা সাক্ষাৎ করেছি। সুযোগ সুবিধা হলেই রঙবেরঙের মুখোশ আমি নাড়াচাড়া করতাম। ক্বচিৎ কখনো মুখের কাছে এনে আবার সরিয়ে ফেলতাম। মুখোশ আমি মনে মনেই পরতাম বেশি। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মুখোশ। আমার মুখোশ সুন্দর নয়। একটি সুন্দর মুখের কল্পনা করতাম। কিন্তু এসব প্রথম জীবনের যৌবন স্বপ্ন। যে ঘটনা বলতে যাচ্ছি তা মাত্র বছর দুই আগের! নানা অফিস ঘুরে-টুরে আমি তখন ভেনাস অ্যাডভারটাইজিং-এ ঢুকেছি। খুব বড় নয়, মাঝারি ধরণের অফিস। পার্টি জুটিয়ে আনতে হয়। কপিও লিখি, করেসপনডেনসও করি। মাইনে যা পাই কোন রকমে সংসার চলে যায়। বেশ চলছিল। সেদিন নিউ ইণ্ডিয়া এনটারপ্রাইজার্সের অফিসে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। ধাক্কা খেলাম পরীক্ষিত সেনের সঙ্গে। পরীক্ষিত সেখানকার পাবলিসিটি অফিসার। অনেক দিনের জানা-

শোনা। এক সময় রাত জেগে গান বাজনা শুনেছি। কিন্তু আজ মুখোমুখি দেখে পরীক্ষিত আমায় চিনতে পারল না। এর আগে অল্প স্বল্প কাজ সে আমাকে দিয়েছে। কিন্তু আজ একেবারে কথাটি বলল না। আমি হাসলাম, সে হাসল না। আমি ডাকলাম, সে শুনতেই পেল না। শুনেছি তার পদোন্নতি হয়েছে, মোটা মাইনের কাজ করে। কিন্তু তার জন্য এমন তো হওয়ার কথা নয়। ভাবলাম হয়তো কাজে ব্যস্ত আছে, হয়তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে বেরিয়েছে, তাই মন খারাপ।

পরীক্ষা করবার জন্যে আর একদিন গেলাম। একই অবস্থা, আরো একদিন গেলাম, একই অবস্থা। বুঝতে পারলাম পরীক্ষিত আর আমাকে কোন দিনই চিনতে পারবে না।

ক্রমে রোগটা আমার পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গানবাজনার আসরে গিয়ে দেখি অনেকেই চিনতে পারে না। অফিসে যার সঙ্গে বসে কাজ করি সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারি সে আমাকে চিনতে পারছে না। পাড়ায় যাদের সঙ্গে রোজ সকালে বাজার করি তারা গা ঘেঁষে চলে গেলেও কথা বলে না।

যতদিন যায় তত আমার অচেনা লোকের সংখ্যা বাড়ে। মানে আমার অচেনা নয়, আমি তাঁদের বেশ চিনি। কিন্তু তাঁরা আর আমাকে চিনতে পারেন না। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা কী হতে পারে। আমার বিরুদ্ধে কোন পুলিশ রিপোর্ট নেই, কোন পাবলিক স্ক্যাণ্ডাল করে বসিনি, আমি ইউনিয়ন টিউনিয়ন করি না, কোন দলাদলির মধ্যে নেই, উপকার করা অবশ্য আমার সাধ্যাতীত, কিন্তু আমি কারো অপকারও করিনি। হয়তো তাও সাধ্যাতীত। কিন্তু যেটুকু আমার সাধ্যের মধ্যে সেটুকু তো করি। পরিচিত কাউকে দেখলে আমি প্রথমে এগিয়ে যাই, মাথা নাড়ি,

প্রথমে কথা বলি। সবচেয়ে আগে কুশল সংবাদ জানতে যাই। বিনিময়ে সেটুকু প্রতিদানও কেন পাইনে? আগে পেতাম। অফিস ছুটির পরে ট্রাম বাস ধরতে পারিনে। বহুদূর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই। সেই জনারণ্যে কেউ আমাকে চেনে না। আমিও হারিয়ে যেতে ভালবাসি। কিন্তু যাদের আমি চিনি, যারা আমাকে চেনে তাদের কাছ থেকে তো আমি বিনা কারণে হারাতে চাইনে।

বড়বাজারে আমার এক বন্ধু থাকে—তারাচাঁদ পাঁড়ে। এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি। কয়েক পুরুষ আগে ইউ পি-তে বাড়ি ছিল। এখন একদম বাঙালী বনে গেছে। তার ক্রিয়াকলাপ আমার মতে একটু অলৌকিক জগৎ নিয়ে। সে হাত দেখে, কোষ্ঠি তৈরি করে। গ্রহদোষ খণ্ডনের জন্য নানারকম মাতুলি আর মণিরত্ন দেয়। আমি কোনদিন ওর ক্লায়েন্ট হইনি। ওর পেশা নিয়ে অল্প-স্বল্প হাসি-ঠাট্টাই করেছি।

বড়বাজারের ছোট্ট গলির মধ্যে ওর অফিস। নিজে বাড়ি করেছে সি আই টি রোডে। কিন্তু এই ছোট্ট সাঁতসেতে পুরোনো বাড়িটা ছাড়েনি। বাড়িটার নাকি খুব পয়। শোনা যায় ওর অলৌকিক সাধনা ওই ঘরেই ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

তারাচাঁদের কাছে আমি মাঝে মাঝে যাই গল্প করার জন্যে। গেলে চা টাও খাওয়ায়।

সেদিন গিয়ে দেখলাম একেবারে রাজবেশে আছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কপালে রক্তচন্দনের তিলক। দুটি কমবয়সী মেয়ে বোধহয় ভাগ্য গণনায় এসেছিল, তারা সরে গেল।

তারাচাঁদ আমাকে দেখে বললে 'কী ব্যাপার?'

ব্যাপারটা বললাম।

তারাচাঁদ বলল, 'সে কি! কেউ তোমাকে চিনতে পারছে না?'

বললাম, 'কেউ কেউ পারছে। আবার কেউ কেউ পারছে না।

ক্রমে অচেনার সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে ইহকালটাই যে পরলোক হয়ে গেল ভাই।'

'তা তো হবেই। তোমরা তো কিছু মানো না।'

আমি ভাবলাম তারাচাঁদ বুঝি কোন গ্রহদোষের কথা বলবে। কোষ্ঠি দেখতে চাইবে। মণিরত্ন ধারণ করার পরামর্শ দেবে। কিন্তু তা কিছু করল না। অপাত্রে রস নিবেদন করারই পাত্র ও নয়।

তারাচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বলল, 'আবে তোমার মুখটা এমন বদলে গেল কী করে?'

আমি বললাম, 'বদলাবেই তো। বুড়ো বয়সে সেই কচি কোমল মুখখানা আর কোথায় পাব।'

তারাচাঁদ বলল, 'আরে না না সেরকম বদলানো নয়। এ যে মুখের আদলসুদ্ধু বদলে যাচ্ছে। নাক চোখ থুতনির গড়ন একেবারে ভিন্ন রকম।' ও আমার থুতনি ধরে মুখখানা উঁচু করে তুলে বললে, 'সাধে কি ওরা তোমাকে চিনতে পারেনি?' সেই দৃষ্টি দেখে বিশেষ করে ওর সেই ছোঁয়ায় আমার গা শির শির করে উঠল। লোকটা বলে কি। তারাচাঁদ বলতে লাগল, 'বন্ধু এই হল যথার্থ পথ। এমন একটা পার্মানেণ্ট মুখোশ যদি দিনরাত পরে থাকতে পারো তোমাকে কেউ চিনুক আর না চিনুক তোমার বয়েই যাবে। এই মুখোশের আড়ালে তুমি ডাকাতি করতে পারো আর না পারো সিঁদ কাটতে পারবে। গাঁট কাটতে পারবে।'

বললাম, 'নাবে ভাই আর কোন কাটাকাটির সাধ নেই। যেভাবে আছি এইভাবে চলে যেতে পারলেই হল।'

নিমগাছের ছায়াঘেরা, গা ছমছম করা তান্ত্রিকের সেই ডেরা থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ আমার মনে হল একটা কী যেন ঘটে গেল। ভূমিকম্পে যেমন ভূপ্রকৃতি বদলে যায়, তেমনি আমার মুখটাও ভিতর থেকে বদলে যাচ্ছে। কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আমি

অনুভব করলাম আমার মুখ আর আমার মুখ নেই। অন্য কারো মুখ হয়ে গেছে। নিজের এই ধারণায় আমি নিজেই হাসলাম, তারপর রুমাল দিয়ে মুখখানাকে ভালো করে মুছে ফেললাম। যেতে যেতে তবু আমার মনে হল দু-তিনজন চেনা লোক আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। কেউ আমাকে লক্ষ্য করল না। আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করল। সর্বনাশ আমি আমার আইডেনটিটি হারিয়ে ফেললাম নাকি? মানুষকে তো মানুষ তার মুখ দেখেই চেনে। মনের দিকে তাকায় আর কজন? সোজা বাড়িতে চলে গেলাম। কড়া নাড়তেই স্ত্রী এসে দোর খুলে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেখ তো আমাকে চিনতে পারছ কি না?'

তিনি তেড়ে এলেন, 'আর জ্বালিয়ো না। তোমাকে সেই ষোল বছর বয়স থেকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি। হাড় মাংশ জ্বালা হয়ে গেল। কোথায় ছিলে এত রাত অবধি? কিছু খেয়েটেয়ে এসেছ নাকি?'

তার সেই গালমন্দও মধুর মত মনে হল। আশ্বস্ত হলাম আমার আইডেনটিটি একেবারে যায়নি। আমাকে সনাক্ত করবার জন্যে ঘরে একজন অন্তত আছেন।

কিন্তু সেই লেডী ওঝা তো সব সময় সঙ্গে থাকেন না। গাঁটছড়া খুলে বাইরে আমাকে রোজই বেরোতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে দুখানি অদৃশ্য হাত একটি অলৌকিক বস্তু আমার মুখে এঁটে দিয়ে চলে যায়। আমার চেনা দুনিয়া আমার কাছ থেকে কমই আড়ালে থাকে। যে দুনিয়াকে আমি দেখি, সে দুনিয়া আমার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন নির্বিকার। বুঝতে পারি, সেই অলৌকিক মুখোশটিরই এই কাণ্ড যেটা আমার মুখে জন্মের মত এঁটে রয়েছে। তা খোলবার উপায় নেই।

শ্রীমন্তবাবু কথা শেষ করে সেই দেবীপ্রতিমার মুখোশটি জয়ার মুখে হঠাৎ পরিয়ে দিয়ে সকৌতুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হেসে বললেন, 'বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে। এবার আমার জন্যে একটি দেবতার মুখোশ কিনে এনো তো অসিত।'

শোক

সকালে উঠেই ফোনটা পেলাম। 'আপনি কি লেখক কল্যাণ কুমার রায়?'

বললাম, 'হ্যাঁ। বলুন।'

নারী কণ্ঠ। গলা শুনে মনে হল বয়স বেশী নয়। গলাটা কিন্তু চেনা মনে হল না।

আমার পরিচয়টুকু জানবার পব ওপাবের কণ্ঠটি নীরব হয়ে রয়েছে।

আমি আবার বললুম, 'বলুন।'

'আপনি কি লীনা রায়কে চিনতেন? ওরা একটা কাগজ বার করেছিল। আপনি তাতে লিখেছিলেন?'

বললাম 'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি ওকে। তাই কি। আপনি কি ওর বন্ধু।'

'আমি ওর বউদি। আমার কথাও ও আপনাকে একবার লিখেছিল। আপনি জবাবও দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন দেখা হলে আলাপ করবেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ, লিখেছিলাম মনে পড়ছে। লীনা কেমন আছে?'

ওপরের কোমল কণ্ঠটি আবার একটু কাল নীরব হয়ে রইল। তারপর ফের সেই গলা শুনলাম। এবার আবেগে আর্দ্র।

'লীনা আর নেই।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কি!'

জন্মের মত মৃত্যুও নিত্যকার ঘটনা। তবু আত্মীয় বন্ধু—এমন কি সাধারণ পরিচিত কারো মৃত্যুও আমাদের ব্যথিত করে, বিস্মিত

করে। মনে হয় যেন এমনটি হবার কথা ছিল না। বিশেষ করে একুশ বছরের একটি মেয়ের মৃত্যুর কথা কে আর আগে থেকে ভেবে রাখে?

দু' তিন সেকেণ্ড সময় নিয়ে আমি বললাম, 'কী হয়েছিল?'

'কিছুই হয়নি। ও সুইসাইড করেছে। আপনি আসুন। এলে আপনাকে সব বলব।'

আমি বললাম, 'গিয়ে আর কী করব।'

লীনার বউদি কাতরকণ্ঠে বললেন, 'না না, আপনি আসুন। ওর বাবা মা আপনাকে দেখতে চাইছেন। আপনি আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।'

ভাবলাম যাকে কথা দিয়েছিলাম সে তো আর নেই। তার বাড়ির আর কারো সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়নি। গিয়ে কী আর হবে।

আবার অনুরোধ এল 'আজ ওর কাজ হচ্ছে। এসব কাজ তো চতুর্থীতেই করতে হয়। আমাদের সবাইর ইচ্ছা আপনি আসুন। আপনি এলে ওর আত্মা তৃপ্তি পাবে।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আজ আবার আমার আর এক জায়গায় বেরোবার কথা আছে। দেখি চেষ্টা করে।'

'চেষ্টা না, আপনি দয়া করে আসুন। এলে আমরা সবাই খুশি হব। ও আপনার কথা প্রায়ই বলত।'

আমি বউটির কাছ থেকে ঠিকানা নিলাম, গিরিশ পার্কের কাছে বিবেকানন্দ রোডের ওপর তিনতলা বাড়ি। চিনে নিতে কোন অসুবিধা হবে না।

টেলিফোনে বললাম, 'আমার যেতে দেরি হতে পারে।'

লীনার বউদি বললেন, 'তা হোক। তবে দুপুরের মধ্যেই আসবেন। তারপর ওর বাবা মা এখান থেকে চলে যাবেন'

আশ্চর্য, আজ সকালে যেখানে আমার নিমন্ত্রণ সেও এক শ্রাদ্ধ-বাড়ি। এক মাস আগে আমার এক প্রবীণ সহকর্মীর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আজ তাঁর পারলৌকিকিকতা।

সকালে লেখালেখি আর হল না। তাড়াতাড়ি শেভটেভ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবলাম। কোথায় প্রথমে যাব? দমদমে লোকেশবাবুর বাড়িতে নাকি গিরিশ পার্কে?

লোকেশবাবুর বাড়িই আগে সেরে আসা সঙ্গত মনে হল। ওর বাড়িতে আমি এর আগে কখনো যাইনি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল ব্যাধিতে তিনি ভুগছিলেন এই খবরটুকুই শুধু জানি। 'তিনি কেমন আছেন' বলে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়েছি।

বাসে করে গেলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই লোকেশবাবুর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

সামনে কয়েকটি মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। লোকেশবাবু বিত্ত-প্রতিপত্তিবান মানুষ। তাঁর অতিথি অভ্যাগতও সেই শ্রেণীর হওয়াই স্বাভাবিক।

দোতলা বড় বাড়ি। সামনে বাগান। আরও খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। সেই জায়গা ঘিরে নিয়ে এখন কীর্তনের আসর বসেছে। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে এক এক আসরে এক এক কীর্তনিয়া। কিন্তু পালা একটিই—চিরবিরহের মাথুর।

যেখানে লোকেশবাবু শ্রাদ্ধের কাজে বসেছেন আগে সেখানে গেলাম।

জন দুই পুরোহিত আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত। একজন বর্ষীয়সী তাঁদের সহায়তা করছেন। খাটের উপর লোকান্তরিতার বড় একখানি প্রতিকৃতি। দামী ফ্রেমে বাঁধানো। তার চারদিক ঘিরে রজনীগন্ধার মালা।

বহু লোকের যাতায়াত। আশেপাশে নানা ধরনের নানা স্বরগ্রামের ধ্বনিপুঞ্জ। ঠিক ঐকতান রচনা করেছে বলা যায় না। একদিকে কাঁসার বাসনকোসন, নানা দ্রব্যসামগ্রী। ষোড়শের উপচার।

এক ফাঁকে আমি গিয়ে লোকেশবাবুর কাছে দাঁড়ালাম। তখন কিছুক্ষণের জন্যে মন্ত্রপাঠে বিরতি হয়েছে। বললাম, 'আপনি নিজেই সব করছেন?'

লোকেশবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসলেন, 'কী করব? আমার তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই। আমিই সব।'

বললাম, 'আপনার ভাইপোরা আছেন শুনেছি।'

'তারা তাদের করণীয় কাজ করছে। আমার করণীয় তো আমাকেই করতে হবে। আমারও তো এই শেষ কাজ। তিনিই সব ছিলেন।'

আমি চুপ করে রইলাম।

এত আয়োজন সম্ভার, এত কর্ম কোলাহলের মধ্যে ওই একটি কথা কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল। সদ্য স্ত্রীবিয়োগকাতর রিক্তসর্বস্ব এক প্রৌঢ়কে নীরব সহানুভূতি জানিয়ে আমি চলে এলাম।

তিনি বললেন, 'কিছু খেয়ে যাবেন কিন্তু। তিনি লোকজন খাওয়াতে বড় ভালোবাসতেন।'

তারপর আরও অভ্যাগতরা এলেন। পুরোহিত আবার তাঁর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করলেন।

আমি খানিকক্ষণ কীর্তনের আসরে গিয়ে বসলাম। সহকর্মীদের সঙ্গে ভোজের আসরেও বসতে হল।

তারপর এক ফাঁকে সেই বৃহৎ শ্রাদ্ধবাসর থেকে বেরিয়ে এলাম।

দু'তিনজন সহকর্মী গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিলেন। আমিও একটু তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এবার মনে পড়ছে আরো এক জায়গায় আমার যাবার কথা।

গাড়িতে দু'একজন অপরিচিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হল। পারস্পরিক পরিচয় জ্ঞাপন। কে কোথায় থাকি, কে কী করি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। আমি তাঁদের পাশে বসে নিভৃত চিন্তার অবকাশ পেলাম।

'তিনি আমার সব ছিলেন।'

আমি তার সব, সে আমার সব এই অনুভব কি আমাদের সারা জীবনের সত্য? যদি হত—জানি না তাতে কী হত। একটি ব্যক্তি কি একটি বস্তুর মধ্যে যদি আমরা সর্বস্বকে পেতাম, স্বকে পেতাম শুধু একটি বাসনার সঙ্গে গ্রথিত, একটি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অঙ্গীকৃত তা হলে জীবনের এই ব্যপ্তি এই বৈচিত্র্য হয়তো থাকত না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জীবনখণ্ডের মধ্যে আমি অখণ্ড এক সমগ্রতাকে অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু তা কি পারি? বহু বাসনার সহস্র ধারায় আমাদের সত্তা খণ্ডিত চূর্ণিত। আমরা ধন চাই, জন চাই, খ্যাতি চাই, প্রতিপত্তি চাই, শেষ পর্যন্ত কি যে চাই তাও ভালো করে জানিনে। তবু এই বহুবচনের মধ্যেও আমরা কখনো কখনো দ্বিবচনের একটা দ্বীপ রচনা করি। বলি, তুমিই আমার সব।' শুনি 'তুমিই আমার সব।'

এই অনুভূতি জীবনের সর্বক্ষণের নয়, কোন কোন ক্ষণের। কিন্তু সেই ক্ষণগুলিই তো মহেন্দ্রক্ষণ।

যেতে যেতে আমি ভাবলাম স্বল্প পরিচিতা একটি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি কেন যাচ্ছি? একটি সামাজিক কৃত্য যেমন সেরে এলাম এও কি তেমনি আর একটি সামাজিক কৃত্য! তা ছাড়া কী। ক্ষণপরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে লীনার শোকার্ত বাবা-মাকে সহানুভূতি জানিয়ে আসব। যে মেয়েটির সঙ্গে নিতান্তই কয়েক দিনের জন্যে আলাপ হয়েছিল, চিরদিনের জন্যে যে হারিয়ে গেছে

স্মরণে কীর্তনে রঙীন বুদবুদের মত সে আবার আমার কাছে নিমেষের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তারপর চিরতরে বিলুপ্ত হবে।

এর মধ্যেই কি ঝাপসা হয়ে যায়নি? মনে পড়ল, মাস কয়েক আগে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের তিনটি ছেলেমেয়ে অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। নতুন কাগজ বের করবে লেখা চায়।

তিনজনের মধ্যে লীনা ছিল সবাইর পিছনে। আর দুজন যখন ওদের কাগজে লেখার জন্য অনুরোধ উপরোধ করছিল ও ছিল চুপ করে।

শুনলাম ফিলোজফি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী কয়েকজন বন্ধু মিলে দল বেঁধেছে। সেই দল থেকেই বেরুচ্ছে কাগজ। কাগজের নাম হবে সপ্তপর্ণী। দলের মূল সদস্য সাতজন। তার মধ্যে তিনজন সামনে এসেছে আর চারজন আছে আড়ালে। পরে তারাও আসবে।

বললাম, 'বেশ তো। বের কর কাগজ। বের হলে এক কপি দিয়ে যেয়ো। পড়ব তোমাদের লেখা।'

ফর্সা মেয়েটি বেশ কথা বলতে জানে। সে বলল, 'আমাদের লেখা কেই বা পড়ে। আপনি যদি পড়েন সে তো আমাদের ভাগ্য। কিন্তু শুধু পড়লেই হবে না। আপনাকে লিখতেও হবে।'

ছেলেটি বলল, 'কিছু না কিছু লিখতেই হবে আপনাকে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—'

আমি পাদপূরণ করে বললাম, 'আশীর্বাণী কি শুভেচ্ছা—'

ফর্সা মেয়েটি—ওর নাম পরে জেনেছিলাম আরতি- বলল, 'না না। শুভেচ্ছা টুভেচ্ছা চলবে না।'

হেসে বললাম, শুভেচ্ছা চাও না?'

আরতি বলল, 'চাইব না কেন? কিন্তু শুভেচ্ছাটাও গল্পের আকারে দেবেন। শুধু দু'লাইন আশীর্বাদ আমরা নেব না।'

তারপর সঙ্গিনী সহপাঠিনীর দিকে চেয়ে বলল, 'এই লীনা তুই চুপ করে আছিস যে। বল কিছু।'

শান্ত মুখচোরা মেয়েটি এবার চোখ তুলে তাকাল, 'তোরা বলছিস তাতে বুঝি হবে না?'

নিতান্তই সাধারণ একটা কথা। কিন্তু বলবার মধ্যে একটু যেন অনন্যতা ছিল। এতক্ষণ ওর নীরব লজ্জাটুকু দেখেছি এবার ওর স্বল্প বাকভঙ্গিটুকুও দেখলাম।

আরতি বলল, 'হচ্ছে কই? দেখছিস না উনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন!'

লীনা শান্তভাবে বলল, 'উনি কি আর সত্যিই এড়াতে পারবেন?'

আরতি বলল, 'কী জোর দেখেছেন? ওকেই লাগিয়ে দেব। ওই পারবে আপনার কাছ থেকে আদায় করে নিতে।'

লীনা বলল, 'লেখা বুঝি ওইভাবে আদায় করা যায়?'

ছেলেটি—ওর নামটাও মনে আছে, প্রশান্ত বলল, 'তা হলে আমরা কবে আসছি বলুন।'

বললাম, 'এখনই ঠিক কথা দিতে পারছি না, তারিখও দিতে পারছি না। পরে তোমাদের জানাব।'

আরতি বলল, 'আপনি কথা দিয়েছেন—আমরা কিন্তু তাই ধরে নিলাম।'

লীনা সঙ্গিনীদের বলল, 'চল এবার, ওঁর আর সময় নষ্ট করিসনে।'

ওর গায়ের রঙ শ্যামল। দেহের গড়ন, মুখাবয়ব এমন কিছু সুশ্রী নয়। কিন্তু ওর গভীর কালো চোখ দুটি বড় সুন্দর। সব মিলিয়ে কেমন একটু লাবণ্য আছে। এই কি যৌবন লাবণ্য?

দলটি চলে যাওয়ার পর ভাবলাম ওরা বেশ লেখাপড়া খেলা নিয়ে আছে। লেখাটা আমার কাছে আর খেলা নয়। কিন্তু খেলার চেয়ে বেশি ওপরে কি তাকে জায়গা দিতে পেরেছি?

আগে কেউ এম. এ. পড়ছে শুনলে কেমন একটা সমীহ ভাব হত। এখন এদের দেখলে স্কুলের কি বড়জোর কলেজের ফাস্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রছাত্রী বলে মনে হয়। চঞ্চল চপল অতি তরুণমতি এই সব ছেলেমানুষরাই দু-এক বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরুবে। কেউ অধ্যাপনা করবে, কেউ বা অন্য কিছু। ওরাই হবে পরিণত বয়সের নাগরিক। ভাবাই যায় না। কেন যে ভাবা যায় না তাও জানি। কারণটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। ওরা ঠিক জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমি আর আমার জায়গায় নেই। বয়স আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেই দূরবর্তী আসন থেকে যুবকদের কিশোরদের বালক বলে ভ্রম হয়।

তারপর আরো দু'একবার ফোন তাগিদ। আমি সময় নিলাম, তারিখ বললাম।

শেষ পর্যন্ত লেখাটি শেষ করলাম।

লীনাই গল্পটি নিতে এল। সঙ্গে আর একটি মেয়ে। না, আরতি কি প্রশান্ত আজ আর আসেনি। অন্য একজন এসেছে। লীনার প্রতিবেশিনী।

টেলিফোনে আগেই কথা বলে রেখেছিলাম। এবার আমি ওকে বাড়িতে আসতে বলেছিলাম।

দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতে প্রথম দিনের আড়ষ্টতা ছিল না। তবে সেদিনও বেশী কথা ও বলেনি। আমিই বরং জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিলাম ওর কে কে আছেন, ও নিজেও লেখে কি না, কী লেখে।

কথায় কথায় ও বলল, 'আমরা গিরীশ পার্কের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা বাড়ি করছেন গ্রামের দিকে। সেখানে শিগগিরই চলে যাব। আপনি যাবেন তো বেড়াতে?'

হেসে বললাম, 'বেশ তো যাওয়া যাবে।'

'আমি গিয়ে চিঠি লিখব। আপনি জবাব দেবেন তো?'

হেসে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

তারপর দু-তিনবার পত্র-বিনিময়ও হয়েছিল। আমি ওকে লিখেছিলাম, 'তোমার নামটি সার্থক। তুমি একেবারে নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছ। অন্তর্লীনা।'

ও প্রতিবাদ করে লিখেছিল, 'আপনি যা ভেবেছেন তা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমি বাইরের বন্ধুদের সঙ্গেও বেশ মিশতে পারি। তাদের নিয়ে হৈ-চৈ কম করিনে। জিজ্ঞেস করে দেখবেন আরতিদের।'

'সপ্তপর্ণীতে' ওর যে রম্যরচনাটি বেরিয়েছিল তাতেও ওর বন্ধু-প্রীতির দৃষ্টান্ত কম ছিল না। প্রত্যেকটি বন্ধুর পরিচয় দিয়ে লীনা উপসংহারে লিখেছিল, 'এরা সবাই ভালো। আর সবচেয়ে ভালো লীনা রায়। কারণ সে ওদের ভালোবাসে।'

লক্ষ্য করেছিলাম সাক্ষাতে ও যতখানি নিরীহ দেখায় ততটা নয়। কলমে ওর অন্য মূর্তি ফুটে ওঠে। সে রূপ প্রাণোচ্ছলতায় চঞ্চল।

অনুমান করেছিলাম আমার কাছে যে মেয়েটি অমন শান্ত মুখ-চোরা হয়ে থাকে সে হয়তো তার সমবয়সী বন্ধুদের কাছে তেমন থাকে না। সেখানে সে অশান্ত হতেও জানে, অশান্ত করতেও জানে।

তৃতীয়বার দেখা হয় আমাদের অফিসের গেটের সামনে। সেদিন সে দল বেঁধে এসেছিল। কমপ্লিমেণ্টারী কপি দিতে। কিন্তু দল থেকে একটু যেন দূরে, একটু যেন আলাদা হয়ে হয়ে ও দাঁড়িয়েছিল।

আমি এক ফাঁকে ওকে বলেছিলাম, 'তোমার চিঠি পেয়েছি। পরে জবাব দেব।'

চিঠির কথায় ও যেন একটু বিব্রত বোধ করেছিল। পরে আমার মনে হয়েছে লেখালেখির ব্যাপারটা বন্ধুদের কাছে প্রকাশ হোক এটা ও চায় না। গোপনতাটুকু ও উপভোগ করতে চায়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে আমার মনে কখনোই একথা আসেনি ওর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে, ও নিজেকে হঠাৎ একদিন বিলীন করে দিতে পারে।

'এই যে গিরিশ পার্কে নামবেন বলেছিলেন? নামুন তা হলে।'

পাশের সহযাত্রীটি আমাকে একটু ঠেলা দিয়ে হেসে বললেন, 'একেবারে তন্ময় হয়ে রয়েছেন কী ব্যাপার বলুন তো?'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'কিছু না।'

সঙ্গী অত সহজে ছাড়লেন না। তেমনি পরিহাসের সুরে বললেন, 'কিছু না বললেই হল? সারাটা পথ আপনি একইভাবে এলেন। কী ভাবছিলেন বলুন তো? গল্পের প্লট? না কোন হিরোইনের কথা?'

হেসে জবাব দিলাম, 'যা বলেছেন।'

গাড়ি থেকে নেমে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকালাম। বড্ড বেলা হয়ে গেছে। প্রায় বারোটা। এমন অসময়ে কোন অপরিচিত বাড়িতে কি যাওয়া যায়?

কার্তিক মাস হলে হবে কি, মাথার ওপরে রোদ বেশ চড়া। প্রখর মধ্যাহ্ন।

রাস্তা পেরোলাম। বাড়ির গায়ে নম্বর লেখা নেই।

একটি দর্জির দোকান চোখে পড়ল। সেখানে গিয়ে বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার সেলাই-কল থেকে মুখ তুলে বললেন, 'বাঁয়ের ওই সরু গলি দিয়ে এগিয়ে যান। গেলেই সিঁড়ি দেখতে পাবেন। সিঁড়ি দিয়ে সোজা তিন তলায় উঠে যাবেন। সেখানেই সব আছে।'

পথের এই নির্দেশটুকু দিয়ে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন, 'আপনি ওদের কেউ হন নাকি?'

বললাম, 'না। হইনে কিছু।'

মাঝবয়সী ভদ্রলোক আবার আমার দিকে তাকালেন, 'আপনি কি এই প্রথম খবর পেয়ে আসছেন ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

দর্জি হাতের কাজ ফেলে রেখে বললেন, 'বড় দুঃখ হয় জানেন ? মেয়েটাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। কত জামা-টামা করে দিয়েছি। স্কুল যেতে দেখেছি, কলেজে যেতে দেখেছি। আমার এই দোকানের সামনে দিয়েই তো যাতায়াতের পথ। অমন শান্ত ধীর স্থির মেয়ে। কেন যে অমন কাণ্ড কবে বসল।'

বললাম, 'আচ্ছা আমি এখন যাই। অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাঁর বোধ হয় আরো কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠলাম। একটি ঘবের দোর ভেজানো। আস্তে কড়া নাড়তে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তিনিও প্রৌঢ়। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বেশ সুন্দর চেহারা।

তিনি বললেন, 'আপনি ?'

নাম বললাম।

তিনি একটু হেসে বললেন, 'ও আসুন আসুন। আমি লীনার বাবা।'

করিডোর দিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি বড় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোরের বাইরে কয়েক জোড়া জুতো। মেয়েদের জুতোই বেশি।

মেঝেয় মাতুর বিছানো। সেই মাতুর এখন খালি। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা হয়তো এতক্ষণে চলে গেছেন। একটু দূরে জন-কয়েক মহিলা বসে আছেন।

একখানি টুলের ওপর লীনার মাঝারি আকারের একটি ফটো।

কবেকার তোলা জানিনে। এই ফটোতে লীনার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। তাঁর আত্মীয়স্বজনের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে সে যেন এখন হাসছে।

পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে অল্প একটু জায়গায় শ্রাদ্ধের কাজ হচ্ছে। পুরোহিত একটি যুবককে মন্ত্র পড়াচ্ছেন। তার বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। পরনে নতুন ধুতি, গায়ে উড়ুনি।

আমি লীনার বাবাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজ কে করছেন?'

'আমার ছেলে। লীনার দাদা।'

একটু আগে স্বামীকে দেখেছি পারলৌকিক কাজ করতে। এখানে দেখছি ভাইকে। অবিবাহিতা কন্যার পারলৌকিক কৃত্যের অধিকারী তার সহোদর।

আমি বললাম, 'এঁর স্ত্রীই কি আমাকে ফোন করেছিলেন?'

লীনার বাবা বললেন, 'না না, সে আমার আর এক বউমা। ভাইপোর স্ত্রী। সুদেব এখনো বিয়ে করেনি। গীতাকে খবর দিচ্ছি। সে ভিতরে একটু ব্যস্ত আছে। বউমা কেঁদে কেঁদে অস্থির। লীনাকে বড় ভালোবাসত। চলুন আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি।'

পাশের ঘরে এলাম। খান দুই সোফা পাশাপাশি পাতা রয়েছে। খানকয়েক গদি-আঁটা চেয়ার। সবই প্রায় শূন্য। এক ভদ্রলোক বসে খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। আর একজন আনমনে চুরুট টানছেন। লীনার বাবা তাঁদের সঙ্গে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'মিঃ গুপ্ত, মিঃ মেনন—আমার বন্ধু। আমরা একই কোর্টে প্র্যাকটিস করি।'

লীনার বাবা আমার সামনের চেয়ারটায় বসলেন। বললেন, 'আপনার কথা লীনা আমাদের বলেছে। আপনি ওকে খুব স্নেহ করতেন।'

আমি চুপ করে রইলাম। বার তিনেক মেয়েটিকে দেখেছি। খান-দুই চিঠি লিখেছি। তাতে পরিচয়ের সূত্রপাত মাত্র ছিল। স্নেহের আত্যন্তিকতা ছিল না। লীনার বাবা বলতে লাগলেন, 'আপনি আমাদের মৌড়ীগ্রামের বাড়ীতে একবার যেতেও চেয়েছিলেন। মেয়ে আমাদের সব বলত। আমাদের কাছে কিছুই তার গোপন ছিল না।'

একটি সুন্দরী বউ ঘরে ঢুকল। ছোট-খাটো চেহারা। পুতুলের মত নরম। চোখ দুটি ফোলা-ফোলা।

লীনার বাবা বললেন, 'এই যে গীতা। কল্যাণবাবু তোমার খোঁজ করছিলেন। তোমার কাকীমাকেও একবাব ডাকো। একটু এসে দেখা করে যাক। উনি এত কষ্ট করে এসেছেন। বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছে। মা তো।'

গীতা বলল, 'আপনার আসতে দেরি হল। ওর সপ্তপর্ণীব বন্ধুরা সবাই এসেছিল। আপনি আসবেন শুনে অনেকক্ষণ ছিল। খানিক আগে চলে গেছে।'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমাব একটু দেরি হয়ে গেল।'

এর মধ্যে লীনার মা এলেন। তিনি দেখতে বেশ সুশ্রী। গায়ের রং ফর্সা। চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশী বয়স মনে হয় না। মা-বাপের তুলনায় মেয়েই বরং দেখতে কালো ছিল।

তিনি মেঝেতেই বসতে যাচ্ছিলেন। গীতা তাঁকে ধবে সোফায় বসিয়ে দিল। নমস্কার বিনিময়ের পব তিনি চুপ কবে বইলেন।

কিছু একটা বলতে হয়, কিন্তু এই শোকার্ত জননীর সঙ্গে কী বলে যে কথা আরম্ভ করব ভেবে পেলাম না।

একটু বাদে তিনিই কথা বললেন।

'আপনি একদিন আমাদের বাড়ীতে যাবেন লীনা বলেছিল। কিন্তু এইভাবে এমন অবস্থায় আপনি আসবেন –'

তিনি থেমে গেলেন। আর কিছু না বলে মুখ নীচু করলেন। তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গীতা বলল, 'কাকীমা, আপনি বরং ও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। এখানে থাকলে অস্থির হয়ে পড়বেন।'

লীনার বাবাও বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যাও। এখন তোমাকে নিয়েই চিন্তা। তুমি আবার কোন বিপদ ঘটাবে কে জানে। গীতা, ওঁকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

গীতা তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। মহিলাটি পরম বাধ্য একটি বালিকার মত তার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চলে গেলেন।

লীনার বাবা বললেন, 'ওঁর শরীর ভালো না। প্রেসার খুব লো। তারপর এই ব্যাপার। ওঁকে সামলানোই এখন কঠিন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন তো সব দিক দেখতে হবে।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

দেখলাম লীনার মার চেয়ে বাবা বেশ শক্ত আছেন। তিনি নিজেকে এরই মধ্যে সামলেও নিয়েছেন। এবার আমি ওঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীভাবে গেল? পটাসিয়াম সায়নায়েড, নাকি স্লিপিং পীল—'

মিঃ রায় বললেন, 'না না, ওসব কিছু নয়।' এই বাড়িরই চার-তলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছি॰॰। লাফিয়ে বোধহয় ঠিক পড়েনি। তাহলে অমন অক্ষত অবস্থায় ওকে পাওয়া যেত না। কার্নিশের ওপরে গিয়ে আলগোছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও তো কোথাও না কোথাও লাগবে? ফেটে যাবে, ভেঙেচুরে যাবে? কিন্তু কোথাও কিছু হয়নি। আশ্চ ব্যাপার। আমি দেখিনি, কিন্তু যারা এসে দেখেছিল তারা সবাই বলেছে, লীনা প্রতিমার মত মাটিতে শান্তভাবে শুয়েছিল। সবই আছে, শুধু প্রাণপুত্তলীটুকু নেই।'

যিনি কাগজ পড়ছিলেন তিনি মুখ তুলে বললেন, 'ভগবানই ওকে

দু-হাতে কোল পেতে তুলে নিয়েছেন, নইলে এমন হতে পারে না। আমরা এখান থেকে ওখানে পড়ে গেলে ছড়ে যায় কেটে যায় কত ভাঙচুর হয়। আমি সেবার বাস থেকে পড়ে গিয়ে সেই যে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলাম তাতে তিন মাস আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আর অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও ওর গায়ে আঁচড়টি লাগল না। এর কী ব্যাখ্যা করবেন বলুন।'

যিনি চুরুট টানছিলেন তিনি বললেন, 'হয়তো পড়ে যাওয়ার আগেই ওর প্রাণটি ভয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরিষ্কার জায়গাতেই পড়েছিল। আশেপাশে জঞ্জাল ছিল, কিন্তু সে-দিকটায় পড়েনি।'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'যা-ই বলুন তাতেও সব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে আমাদের ধারণাতীত এক পরমাশ্চর্য শক্তি রয়েছে যার-রহস্য আমরা কোনদিন উদ্‌ঘাটন করতে পারব না—একথা স্বীকার করতে বাধা কি ভবেশবাবু?'

ভবেশবাবু একটু হেসে বললেন, 'বাধা নেই। কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোচটা কী হবে তাই নিয়ে কথা। রহস্যকে আমরা মানি। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আমরা সে রহস্য উন্মোচনের পথে এগোতে চাই দেবতোষদা।'

দেবতোষবাবু বললেন, 'কতটুকু জোর আপনার সেই যুক্তি-বুদ্ধির। আমরা তিন জনেই ওকালতি করে খাই। খেয়ে-পরে আছি। যার যেমন সাধ্য। গাড়ি-বাড়িও করেছি। কিন্তু সেই বুদ্ধির জোরে বিজ্ঞান নিয়ে গর্ব করা আমাদের সাজে না। বিজ্ঞানের আমরা কতটুকু কি জানি ভবেশবাবু?'

শোকের বাসরে এই অপ্রাসঙ্গিক তর্ক-যুদ্ধে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম।

লীনার বাবার দিকে তাকিয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন এমন করল? কারণ কিছু জানা গেছে?'

মিঃ রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'না, কিছু জানায়নি। শুধু সবাই যেমন লেখে খুকুও তেমনি লিখে রেখে গেছে তার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। আব বড় একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে তার মাকে। তাতে সব তত্ত্বকথা। আমরা যেন কেউ দুঃখ না করি। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুনুন কথা! বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে খাওয়ালাম, পরালাম, পেলে-পুষে বড় করলাম, তাকে নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা কত স্বপ্ন গড়ে তুললাম, এখন সে শুনিয়ে গেল, সে যে ছিল আর সে যে নেই এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।'

ভদ্রলোকেব গলা ধবে গেল।

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

একটু বাদে মিঃ রায় নিজেই ফের কথা বললেন, 'প্রত্যক্ষ কারণ কিছু দেখি না। তবে ওব একটা ব্যাধি ছিল অ্যাজমা। ছেলেবেলা থেকেই এই বোগ। অনেক চিকিৎসাপত্র করিয়েছি, সারেনি। ও তার জন্যে মাঝে মাঝে খুব আনমনা হয়ে পড়ত। মৃত্যুচিন্তাও করত। কখনো কখনো বলত কী হবে আর বেঁচে। আমি তো আর জীবনে কাউকে সুখী করতে প ‌াব না। আমি ওকে বলতাম কেন পারবি নে? সুখেব চেহারা কি এক? এব চেয়েও কত কঠিন ব্যাধি নিয়ে মানুষ বিয়ে করে সুখীও হয়। .ব ক্ষেত্রেই অসুখ সুখের বাধা হয় না। তবু তোর যদি বিয়ে-থা করতে ইচ্ছা না হয়, নাই বা করলি। লিখবি পড়বি, তাই নিয়ে থাকবি। সারা জীবন জ্ঞানের চর্চায় যদি ডুবে থাকা যায় তাতেও কি কম সুখ?'

এবার ভক্তিকামী আর যুক্তিকা.. দুই ব্যবহারজীবীই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, প্রায় একই সঙ্গে বললেন, 'আমরা চলি। বড্ড বেলা হয়ে গেল।'

মিঃ রায় বললেন, 'চলুন, আপনাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে

আসি। গীতা, তোমরা এ-ঘরে এসো। ওঁর কাছে এসে বোসো। আমি নিচ থেকে এক্ষুনি আসছি।'

ওঁরা চলে গেলে গীতা আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এল। পরিচয় করিয়ে দিল। পিসতুতো বোন হয় লীনার। বাসবী সেন। বি এস-সি পড়ে।

এবার গীতার হাতে বড় একটি অ্যালবাম দেখলাম। অ্যালবামে বেশির ভাগই লীনার নানা বয়সের ফটো। ওর সেই শিশু বয়স থেকে যৌবন পর্যন্ত নানা সময়ের নানা মূর্তি দেখতে দেখতে আমি ভাবলাম মেয়েটির মনে কোথায় কবে যে আত্মনিধনের সঙ্কল্প এসে বাসা বেঁধেছিল তার এই জীবনলীলায় তা বুঝবার উপায় নেই। অ্যালবামের এই সব ছবিতে লীনা কখনো তার বন্ধুদের সঙ্গে আছে, কখনো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, কখনো নাচছে, কখনো কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে মিলে থিয়েটার করছে, কখনো কনভোকেশনের ধরাচূড়া পরে প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। এই উচ্ছল উজ্জ্বল চিত্রমালার মধ্যে কোথাও মৃত্যুর বীজকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু মৃত্যু আছে, তবু মৃত্যু আসে। সে মৃত্যু সব সময় গৌরবের নয়। অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু। এই মৃত্যুর স্বাদ আমি নিজেও কি পাই নি? শুধু স্বজনবন্ধুর মৃত্যু নয়, স্বকীয় মৃত্যুর? বীরেরা একবার মরে, কাপুরুষরা শতবার। মহাকবির উক্তি। কিন্তু তারাই সংসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই কাপুরুষেরা, যারা জীবনে অসংখ্যবার ভয়ে মরে, লজ্জায় মরে, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে মরে। আত্মহত্যার ইচ্ছা তাদের মনেও জাগে। কিন্তু সে সাহসে কুলোয় না। সাহস! আত্মহত্যাকারীকে আমরা সাহসী বলি না। হত্যাকারীকে বরং সে মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু যে আত্মহত্যা করে সে ভীরু, চিরকালের পলাতক। সে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না বলে জীবনকে সহ্য করতে পারে না বলেই পালায়। লীনা, আমি জানি

না, তোমার এই প্রগাঢ় যৌবনে কেন তুমি এই ভীরুতার অপবাদ নিয়ে চলে গেলে।

লীনার মা আবার উঠে এসেছেন। একটি প্লেটে করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন কয়েকটি।

আমি বললাম, 'এ সব কী? এই কি খাওয়ার সময়?'

তিনি বললেন, 'একটু নিন। তার আত্মা তৃপ্তি পাবে।'

আমি ভাবলাম বিদেহী আত্মা। আমার স্মৃতি আর কল্পনা ছাড়া তার আর কোথাও কি কোন অস্তিত্ব আছে?

একটি মিষ্টি তুলে নিলাম। এক গ্লাস জলের প্রায় পুরোটাই খেয়ে ফেললাম।

এবার আমিও উঠব। হঠাৎ আমার মনে হল, যে ছাদ থেকে লীনা লাফিয়ে পড়েছিল সেই জায়গাটা একটু দেখে যাই।

প্রস্তাবটা একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই করলাম।

গীতা বলল, 'চলুন না।'

সে আর বাসবী আমাকে নিয়ে ছাদে উঠল। বেশ বড় বাড়ি। এ ঘরের পাশ দিয়ে ও ঘরের সমুখ দিয়ে পথ। সরু সিঁড়ি। ছাদের ওপরও সারি সারি ঘর তোলা হয়েছে। উত্তর দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পূবে পশ্চিমে প্রসারিত কার্নিশ। নীচে ছায়াচ্ছন্ন সরু গলি।

আমরা কার্নিশের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। গীতা বলতে লাগল, 'এ আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি। আমরা ভাড়াটে ছিলাম। তারপর গাঁয়ে বাড়ি করে লীনার বাবা মাত্র মাস-তিনেক আগে উঠে চলে গেছেন। আজীবন লীনার এই বাড়িতে কেটেছে। আমি এসেছি মাত্র তিন বছর। কিন্তু যতদিন এখানে ছিলাম রোজ সন্ধ্যা-বেলায় এখানে আসতাম। লীনা আর আমি। রাত হয়ে যেত। তবু নামতে ইচ্ছা করত না। দুজনে মিলে কত গল্প, কত গল্প।

কত সব কথা। কে জানত ওর মনে এই ছিল। ও এখান থেকেই—'

হঠাৎ কার্নিশের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গীতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সে কান্না আর থামে না।

আমি মহা অপ্রস্তুত। আগে জানলে কে আর এখানে আসতে চাইত।

বাসবী বলল, 'এ কী হচ্ছে বউদি, এ কী হচ্ছে। উনি কী ভাববেন বলতো।'

তারপর খানিক আগে গীতা যেমন লীনার মাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, বাসবীও তেমনি সস্নেহে সযত্নে শোকার্তা বউদিকে তুলে ধরে আগলে নিয়ে চলল।

আমি ওদের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। ততক্ষণে লীনার বাবাও ফিরে এসেছেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়।

সেই দর্জির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আশেপাশের বাড়িগুলি দোর-জানলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু রাস্তায় যানবাহন ঠিকই চলছে। তবু আমি চারদিকে খর মধ্যাহ্নের এক স্তব্ধ নিশ্চলতা অনুভব করলাম।

একটু এগোতেই দেখি একটি যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিনতে পারলাম। সেই সপ্তপর্ণীর প্রশান্ত।

বললাম, 'আরে তুমি?'

প্রশান্ত বলল, 'আপনিও এসেছিলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি ওপরে যাওনি?'

প্রশান্ত উদাসভাবে বলল, 'না, ওপরে গিয়ে আর কী হবে?'

আমি বললাম, 'তোমাদের প্রথম সংখ্যা কাগজ পেয়েছি।'

প্রশান্ত বলল, 'প্রুফের অনেক ভুল ছিল। কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'লীনাও সে কথা আমাকে লিখেছিল। আমার লেখার প্রুফটা নাকি ওরই দেখে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি।'

প্রশান্ত একটু হেসে বলল, 'দেখালও যেন কত ভালো হত। ও যেন কত প্রুফ দেখতে জানত।'

বললাম, 'তোমাদের দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখা দেওয়ার জন্যে লীনা আমার কাছে আরো একবার গিয়েছিল।'

প্রশান্ত বলল, 'জানি। আমি সেদিন ছিলাম না। দ্বিতীয় সংখ্যা কি আর বেরোবে?'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, কেন এমন করল বল তো? কারণটা কী?'

প্রশান্ত আমার দিকে তাকাল। তারপর একটু রুক্ষ কিন্তু উদাস সুরে বলল, 'কারণ আমিও কিছু জানি না। শুনেছি পুলিস ওর সব চিঠিপত্র ডায়েরি-টায়েরি নিয়ে গেছে। তারা যদি কারণ খুঁজে বার করতে পারে করুক। আমার কোন কৌতূহল নেই। একজন ছিল, সে চলে গেছে। আর জানবার কী আছে, বলুন?'

তরুণ বয়সী এই ছেলেটির এই নির্বেদ বৈরাগ্যে আমি চুপ করে রইলাম। একটু যেন লজ্জাও হলো। নিঃশব্দে ওর সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের দিকে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ প্রশান্তর মুখের পাশে আর একটি মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সদ্য-বিপত্নীক সংহত শোক এক প্রৌঢ়ের মুখ। তাঁর মুখেও এই একই রিক্ততা একই বৈরাগ্য আজ সকালে দেখে এসেছি।

বীজ

ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে প্রফুল্লবাবু দেখলেন তিনি যে চেয়ারটায় বসে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করেন সেটি অন্য একজন দখল করে বসে রয়েছে। যুবকটির পরনে চোঙা প্যান্ট। গায়ে নীলরঙের হাফশার্ট। চুলগুলি বড় বড়। হালফ্যাশন অনুসারে দুই গালে প্রলম্বিত জুলপি। যুবকটি ডাক্তারের সঙ্গে মৃদুস্বরে কী যেন বলছিল। রোগ-ব্যাধির কথাই হবে। ডাক্তারের সঙ্গে লোক আর অন্য কী নিয়ে আলাপ করে।

যুবকটির কথা শুনে ডাক্তার একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'দেখ, তোমাকে তো বলেছি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার কাছে ঘোরাঘুরি করে কিছু লাভ হবে না। তোমাদের এ সমস্যার আমি কোন সমাধান করতে পারব না। তা ছাড়া এখন আমি বড় ব্যস্ত।'

যুবকটি সবিনয়ে বলল, 'তাহলে কাল আসব ?'

ডাক্তার একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, 'এসো।'

'ওকে নিয়ে আসব ?'

'যদি আসতে চায় এসো।'

'এই সময় ?'

'বেশ তো।'

'আপনি কিছু করবেন তাহলে ?'

ডাক্তার আবার একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, 'কেন কথা বাড়াচ্ছ। তোমাকে তো বলেছি আমি তেমন কোন হেল্‌প করতে পারব না।'

যুবকটি নাছোড়বান্দা। এর পরেও সে উঠে দাঁড়াল না। আরও

অনুনয় করে বলল, 'দেখুন, আপনাকে আমি ঠিক ডাক্তার হিসেবে দেখি নে। বন্ধু বলে মনে করি, অভিভাবক বলে মনেকেরি। আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাই।'

ডাক্তারের মন এবার একটু নরম হল। কিছুটা কোমল স্বরে বললেন, 'আচ্ছা কাল এসো। কাল কথা বলব। আজ এখনো অনেক পেসেণ্ট ওয়েট করছে। সময় এত কম—।'

যুবকটি এবার বিদায় নিল।

প্রফুল্লবাবু তাঁর কোণের চেয়ার থেকে লক্ষ্য করলেন যুবকটি বেশ লম্বা। ছ' ফিটের কাছাকাছি হবে। গৌরবর্ণ, টানা টানা চোখ। চেহারাটা মোটামুটি সুশ্রী। কিন্তু শরীরের ওপর যত্ন নেই। পোশাকে-আসাকে সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব। এই বয়সেই এত ঔদাস্য কেন কে জানে।

ডাক্তারের চেম্বারটি বড় রাস্তার ওপর। এখন এই রুটে অনেক-গুলি বাস চলাচল করে। পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে অনবরত বাসগুলি ছুটোছুটি করে। প্রফুল্লবাবুর দেখতে খুব ভালো লাগে। এই বৃদ্ধ বয়সেও নিজেদের পাড়ার এই একমাত্র বড় রাস্তাটির জন্যে তিনি বালকের মত গৌরববোধ করেন। এখন এই বেশি রাত্রে বাস-চলাচল কমে গেছে। চলছে ভারি ভারি লরি। চট কি ক্যানভাসে ঢাকা কি সব মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। এই কদাকার বিদঘুটে চেহারার লরিগুলি দেখলে প্রফুল্লবাবুর মনে কেমন যেন একটা অশুভ, অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে।

যুবকটি ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে বোধহয় বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে গেল। প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টি অতদূর যায় না। চোখে হাই পাওয়ারের গ্লাস। দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও শ্রুতি কিন্তু ঠিক আছে। যুবকটি ডাক্তারের সঙ্গে মৃদুস্বরে যে সব কথা বলছিল, সবই কানে গেছে প্রফুল্লবাবুর। অন্যের কথায় আড়িপাতা উচিত হয়নি।

তবু না শুনে পারেন নি। এই বয়সে উত্তর-পুরুষের অনেক কথায় বরং বধির হয়ে থাকতে হয় ; অনেক ক্রিয়াকলাপে থাকতে হয় অন্ধ হয়ে।

যুবকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন মোটা-সোটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসন জুড়ে বসলেন। বসেই কাতর স্বরে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, কেশে কেশে মরে গেলাম।'

ডাক্তার একটু হেসে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? হাঁ করুন। আর একটু জোরে হ্যাঁ করুন।'

ডাক্তার টর্চের আলো ফেললেন রোগীর মুখগহ্বরে। তারপর বললেন, 'না, গলায় কিছু নেই। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। আপনার তো কসকোপিন প্লাসেই গতবার সেরে গিয়েছিল। এবারো তাই খান। দুই চামচ করে দিনে তিন চারবার। আর দু বেলা গার্গেল করবেন ভালো করে। সেরে যাবে।'

ছোট্ট প্যাডে ডাক্তার খচ্ খচ্ করে প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন।

কাশির রোগীর পরে এল বাতের রোগী। তারপর এলেন একজন দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে। ভদ্রলোক বেশ রসিক। অত কষ্টের মধ্যেও রসিয়ে বললেন, 'জীবনে আর তো কোথাও কোন রস নেই ডাক্তার-বাবু। যত রস এখন দাঁতের গোড়ায় জমেছে। দাঁতরসায় বড্ড ভুগছি।'

ডাক্তার তাঁর দাঁত পরীক্ষা করে বললেন, 'আপনাকে ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে।'

রোগী বললেন, 'তার মানে দাঁতালের কাছে ? দাঁতালও যা মাতালও তাই। দেখলেই সাঁড়াশী নিয়ে তেড়ে আসবে।'

ডাক্তার তাঁকে অভয় দিয়ে হেসে বললেন, 'না, এক্ষুনি যে একসট্রাকট করতে হবে তার কোন মানে নেই। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। এখনকার মত রিলিফ পাবেন।'

আর এক ভদ্রলোক এলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর জ্বর। ডাক্তার

সব শুনে বললেন, 'আগের মিকশ্চারই চলবে।' কম্পাউণ্ডার ছেলেটির দিকে চেয়ে বললেন, 'ওহে অতুল, ওঁকে একটা মিকশ্চার বানিয়ে দাও তো।'

লম্বা বেঞ্চটায় আরো চার-পাঁচজন রোগী বসে আছে। প্রফুল্লবাবু তাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। পাড়ার জেনারেল ফিজিসিয়ান। সর্বরোগে বিষহরি। সাধারণ রোগীরা যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাধি নিয়ে এই শচীন ভদ্রের কাছে ছুটে আসে। প্রফুল্লবাবু ডাক্তারকে খুব স্নেহ করেন। বলতে গেলে ছেলের বয়সী এই শচীন। কত আর বয়স হবে ওর। বড়জোর পঞ্চাশ। প্রফুল্ল সমাদ্দার পঁচাত্তর পেরিয়েছেন। হৃদরোগে মাঝে মাঝে ভোগেন। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভালোই আছে। তিনি আসেন ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করতে। তিনি তাকে সেকালের গল্প বলেন। ডাক্তার একালের গল্প শোনায়।

আরো পনেরো-বিশ মিনিট। তারপর ডাক্তারের চেম্বার রোগী-মুক্ত হল।

প্রফুল্লবাবুর দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন, 'এবার আসুন। বসুন এসে এখানে।'

প্রফুল্লবাবু এগিয়ে এসে ডাক্তারের চেয়ারে বসলেন, হেসে বললেন, 'ডাক্তারি না পড়ে কি ভুলই না করেছি। রাত এগারোটা বাজে। এখনো তোমার ঘরভরা খদ্দের লক্ষ্মী।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'আপনার আশীর্বাদ। আপনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নইলে এ পাড়ায় আমার প্র্যাকটিস জমত না। এখানে রোগীর চেয়ে এখন ডাক্তার বেশি। আপনি হেল্‌প না করলে—'

প্রফুল্লবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'আরে ছেড়ে দাও ওসব।'

এবার ডাক্তার তাঁর সুগোল ডিবেটি খুলে একটি পান মুখে

দিলেন। দেরাজ খুলে প্রফুল্লবাবুর জন্যে বের করে আনলেন এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই। 'নিন। আপনার জন্যে আনিয়ে রেখেছি।'

প্রফুল্লবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্কস। ওসব মালমসলা তো আমার কাছেই ছিল। এনেছ যখন দাও। তোমারটাই খাই।'

শচীন ভদ্র সিগারেট খান না। নইলে প্রফুল্লবাবু তাকেও একটা ধরাতে বলতেন।

সিগারেট ধরিয়ে প্রফুল্লবাবু ঝুঁকে পড়ে নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন, 'ইস, এগারোটা বাজতে দশ। এবার উঠতে হবে। ডাক্তার, তোমার ওই ছোকরার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল তো।'

ডাক্তার বললেন, 'কোন ছোকরার ব্যাপার?'

'আরে ওই যে লম্বা চোয়াড়ে চেহারার ছেলেটা। তোমাকে কিসের জন্য যেন কাকুতি-মিনতি করছিল। কেবল পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে।'

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, 'আমার এত পেসেন্ট থাকতে ওই চোয়াড়ে ছেলেটার দিকেই আপনার চোখ পড়ল কেন?'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'পড়বে না? তোমার ঐ কাশির রোগী, দাঁতের রোগী, আমাশয় রোগীর মধ্যে কোন মিষ্টি নেই। কিন্তু ওই ছেলেটা যেন একখণ্ড রহস্য উপন্যাস।'

ডাক্তার বললেন, 'উপন্যাসই বটে। আপনার ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ। যেখানে গল্পের গন্ধ পান ঠিক চিনে নিতে পারেন। তাহলে শুনুন। রাত হয়ে গেছে। সংক্ষেপেই বলি। দয়া করে নাম জিজ্ঞেস করবেন না। আমাদের প্রফেসনাল এথিক্সে বাধে।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। নাম তুমি বানিয়েও বলতে পার কি সর্বনাম দিয়েও কাজ চালাতে পার। অল্পবয়সী সুন্দরপানা

কোন ছেলে-মেয়েকে দেখলে তাদের নাম জিজ্ঞেস করে বসি। এই এক দোষ আছে আমার। কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাই। কত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের নাম যে ভুলে গেছি তার ঠিক নেই। কোনরকমে নিজের আর নিজের বাপ-দাদার নাম ক'টা মুখস্থ করে রেখেছি এই যা। কিন্তু আর বাজে কথা নয়। রাত বেড়ে যাচ্ছে। তুমি এবার শুরু কর।'

কম্পাউণ্ডারকে জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'ছেলেটি বিশিষ্ট ভদ্র ঘরের। চিকিৎসার ব্যাপারে যেমন আরো পাঁচটি পরিবারে যাই তেমনি ওদের বাড়িতেও আমার আসা-যাওয়া আছে। ওর বাবা উকিল। ওপরে বড় তিন ভাই। ব্যাঙ্কে, এল আই. সি-তে ভালো ভালো চাকরি করে। দুই বোন। তাদের ভালো ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু ওরই কিছু হল না। দু দুবার বি. এ. পরীক্ষা দিতে গিয়ে হল থেকে উঠে এল। বিদ্যাস্থানে সেই যে শনির দৃষ্টি পড়ল তা আর নড়ল না। বুদ্ধি স্থানেও শনি লেগে রইল। লোকে আজকাল চাকরি-বাকরি প্রাণপণ চেষ্টা করেও পায় না। কিন্তু ও গা লাগিয়ে কোন চেষ্টা করল না। কিছু পাবে না বলে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল। নিজের যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে নতুন কিছু শিখতে চেষ্টা করল না। কোন ব্যাপারে ওর আগ্রহ নেই। কারো কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতাও ওর চলে গেছে। দেওয়ার কথা তো ওঠেই না।

'বাড়িতে কতখানি ওর আদর-যত্ন হত বলা শক্ত। যত আদরই হোক, ও বুঝতে পারত ও নিজেদের বাড়ির কেউ না। ওর দাদা-বউদিরা এক জাতের মানুষ, আর ও অন্য জাতের। ওর মনে এমন একটা কমপ্লেক্স ঢুকে গেল, ওর ধারণা হল ও যেন সকলের অনাত্মীয়, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। পাছে ওকে কেউ অবজ্ঞা করে, অপমান করে, তাই ও নিজেই আক্রমণকারীর রোল নিল। ও নিজেই আগে আঘাত

করে। খোঁটা দিয়ে কথা বলে, খোঁচা দিয়ে কথা বলে। ওর চড়া গলায় বাড়ির আর সবাইয়ের গলার স্বর ডুবে যায়। তারপর আরও নানারকমের সঙ্গদোষ ঢুকতে লাগল। মদ ধরল। খরচ জোগাবার জন্যে জুয়োর আড্ডায় যাতায়াত শুরু করল। নামে মাত্র ও পরিবার-ভুক্ত। আসলে ও বাইরের লোক। কাউকে ও স্বজন মনে করে না। ও জানে ও বিচ্ছিন্ন, বর্জিত, এক অভাজন।

'এই তো গেল আপনার হিরো। এবার হিরোইনের কথা শুনুন। সে-ও একই পাড়ার মেয়ে। আমি তাদেরও ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। এই ফ্যামিলিটি আরো হতভাগ্য। বাড়ির বড় দুটি ছেলে বিয়ে-থা করে আলাদা হয়ে গেছে। তারা বাপ-মায়ের খোঁজখবর নেয় না। বাপের অপরাধ, বাপ শুধু তাদেরই বাপ নন, আরও তিন-চারটি ছেলেমেয়ের জন্মদাতা। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, এই বাক্যে কে-ই বা আজকাল আর বিশ্বাস করে। আহার তিনি জোগালেও মানুষের হাত দিয়েই তা জোগান। মেয়েটির বাবাও তা জুগিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বাথরুমে পড়ে গিয়ে বিভ্রাট বাঁধালেন। হাই ব্লাডপ্রেসার ছিল। এবার প্যারালিসিসে অসাড় হয়ে রইলেন। বিছানা থেকে নড়তে পারেন না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। শুধু মুখখানা সক্রিয়। বড় মেয়ের ওপর ভার পড়ল সংসারের। বয়েস আর কত হবে। একুশ-বাইশের বেশি নয়। বিদ্যায় সে-ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। রূপের দিক থেকে নিতান্তই সাধারণ। গায়ের রং কালো। অপুষ্ট দেহ। ছিপছিপে লম্বা। তবে চোখে-মুখে একটু শ্রীছাঁদ আছে। চালাক-চতুর। কথাবার্তা বলতে পারে। হয়তো দায়ে পড়েই এসব রপ্ত করতে হয়েছে। মেয়েটি টাইপ শিখে নিয়েছিল। কোন একটা অখ্যাত ফার্মে চাকরিও জুটিয়ে নিল। প্রাইভেট ফার্মে ওর মত একটি মেয়ে টাইপিস্টের মাইনে আর কত হবে। সেই আয়ে একটা সংসার চলবার কথা নয়। কিন্তু কোনরকমে চলে যায়।

লোকে নানা কথা বলে। তারা বলে অফিসের মাইনেই নয়, মেয়েটির রোজগারের আরো গোপন পথ আছে। সত্য-মিথ্যে জানিনে। তবে মেয়েটির চালচলন দেখে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। সে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। অত ভালো ভালো শাড়িই বা তার আসে কোত্থেকে। শুনেছি ওদের দুজনের আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল। কিশোর বয়সের বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব আজ থাকবার কথা নয়। কিন্তু কিভাবে যে রয়ে গেছে কে জানে। পথে-বিপথে মাঝে মাঝে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তারপর কি হয় না হয় আমি জানি না, ওসব তো কেউ আর চোখে দেখে না। ছেলেটির গায়ে জোর আছে। ছোটখাটো বিপদ-আপদ থেকে মেয়েটিকে সে রক্ষা করেছে। ছেলেটি পুলিসের হাতে পড়লে নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে মেয়েটি ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। দরকার হলে অল্প-স্বল্প টাকাও ধার দিয়েছে। সে ধার আর শোধ হয়নি। টাকা দেওয়ার সময় মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, 'আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও, তুমি এই টাকা দিয়ে মদ খাবে না, জুয়ো খেলবে না।' ছেলেটি কথা দিয়েছে, কিন্তু কোনদিনই কথা রাখতে পারেনি। মেয়েটি যখন এই নিয়ে খোঁটা দিয়েছে, ছেলেটি ব্যঙ্গ করে বলেছে, 'ভারি আমার সতী সাধ্বী রে! যে পথের টাকা, সেই পথেই গেছে। ভালোই হয়েছে।'

এ-সব কথা মেয়েটিই আমাকে তার দুঃখের সময় বলেছে। সে-ও পেসেণ্ট। দুঃসময়ে মানুষ উকিল-ডাক্তারকে সব বলে।

তারপর শুনুন কাণ্ড। মেয়েটি কন্‌সিভ করে বসল। আজকালকার দিনে কণ্ট্রাসেপটিভ তো প্রায় অব্যর্থ। তবু কখনো কখনো তাও ব্যর্থ হয়। মেয়েটি হয়তো সতর্ক ছিল না। রক্ষাকবচ পরে বেরোয়নি।

ছেলেটি এসে বলল, 'আপনাকে এর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। খরচ যা লাগে দেব।'

আমি বললাম, 'এসব কাজ আমি করিনে।'

ছেলেটি বলল, 'কেন? আজকাল তো এসব লিগ্যালাইজড্ হয়েছে, আইন পাস হয়ে গেছে। এখন আর আপনার ভয় কিসের?'

আমি বললাম, 'আইনটাই তো সব নয়। তা ছাড়া যা করতে চাইছ তা আইনের মধ্যে পড়ে না। আইনের বাইরে পড়ে যায়। তার চেয়ে তোমরা বিয়ে কর না কেন? সবচেয়ে ভালো হয়।'

ছেলেটি বলল, 'বিয়ে করবার মত সঙ্গতি কোথায়?'

বললাম, 'কেন, তুমি তো নাকি একটা চাকরি পেয়েছ?'

ছেলেটি বলল, 'অস্থায়ী চাকরি। কারখানার কাজ। আমার মোটেই ভালো লাগে না। ওরা ছাড়াবার আগে আমিই ছেড়ে দেব। ভেবে দেখুন আমাদের মত লোকের কি বিয়ে করা উচিত? সন্তানের বাপ-মা হওয়া উচিত?'

মেয়েটির ধারণা কিন্তু আলাদা। সে চায় স্ত্রী হতে, সে চায় মা হতে, চায় ঘব বাঁধতে।

কিন্তু ছেলেটির ঝোঁক অন্যদিকে। সে কোন বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। নিজের পারিবারিক বন্ধনকে সে অস্বীকার করেছে। সামাজিক আইন কানুন নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনকে সে মানে নি। সবই যেন তার ওপর ওপর। গভীরে ডুব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কি আগ্রহ নেই। নেই যে ছেলেটি তা ভিতরে ভিতবে জানে। এই জন্যেই যে কোন দায়িত্ব থেকে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কোন দায়কেই দায় বলে স্বীকার করে না।

এমন একটি ছেলেকে মেয়েটি যে কী করে ভালোবাসল সে-ই জানে। কিন্তু আমি তো শুধু ডাক্তারের চোখ দিয়ে রোগীকে দেখেছি। লাভারের চোখ দিয়ে তো আর দেখি নি। মেয়েটি হয়তো ওর বিশেষ কোন গুণাগুণ লক্ষ্য করে থাকবে। ছেলেটির বিশেষ কোন অভ্যাস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোন ভঙ্গি মেয়েটিকে মুগ্ধ করেছে, দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। কিছুই বলা যায় না।

নিশ্চয়ই কোন কোন বিষয়ে ওদের মধ্যে মনের মিল রুচির মিল আছে। কিন্তু একটা বিষয়ে দারুণ অমিল দেখা দিল। ঘোরতর মতবিরোধ। মেয়েটি তার সন্তান রাখতে চায়, ছেলেটি চায় না।

ছেলেটি বলে, 'বেশ, বিয়ে আমি করব। কিন্তু ওই অবস্থায় নয়। আগে ওসব পরিষ্কার হয়ে যাক। তারপর।'

আমি ওকে একদিন একধারে ডেকে বললাম, 'তুমি এতে আপত্তি করছ কেন? তোমার ছেলে আসছে, নতুন একটি মানুষকে তুমি পৃথিবীতে নিয়ে আসছ ভেবে আনন্দ হচ্ছে না তোমার?'

ছেলেটি হঠাৎ বলে বসল, 'যে আসছে সে যে আমারই সন্তান তা কি ও হলফ করে বলতে পারবে? বললেও আমি বিশ্বাস করি নে।'

আমি একটু স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কোথায় ওর আসল দুর্বলতা। বাচ্চা হলে কি করে খাওয়াবে পরাবে সেটা ওর বড় চিন্তা নয়, পাছে অন্যের বাচ্চাকে নিজের বলে চালিয়ে নিতে হয় সেটাই ওর বড় দুশ্চিন্তা।

মেয়েটি পরে একদিন আমার কাছে এলে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম, 'তোমার বন্ধু ঠিক এই ইস্যুটিকে চাইছে না।'

মেয়েটি লজ্জাবতী কিশোরী নয়। চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারল। তারপর বেশ তেজের সঙ্গে বলল, 'কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলাম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি রাগে ফেটে পড়ল। বলল, 'বুঝেছি। জানেন ওর মুখদর্শনও পাপ। ওর মুখ আর কোনদিন আমি দেখব না।'

মেয়েটি শান্তশিষ্ট নয়। কিন্তু এমন রাগও ওর কোনদিন দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল ওর এই মাত্রা-ছাড়া রাগটা সাজানো নয়

তো ? কে জানে কে দোষী কে নির্দোষ। আমার কেমন যেন খটকা লাগল।

তারপর মুখ-দেখাদেখি যে সত্যই ওরা বন্ধ করেছে তা নয়। ঝগড়া করবার জন্যেও তো মুখোমুখি হতে হয়। ওঁরা ঝগড়া করে, একজন আর একজনকে অশ্রদ্ধা করে, হিংসা করে. আবার তীব্রভাবে ভালোও বাসে। ওদেব ভালোবাসা আমার ওষুধের শিশির মিকশ্চাবের মত। ওরা দুজনেই উঁচু জাতের কেমিস্ট।'

ডাক্তার একটু হেসে তাঁর কাহিনী শেষ করলেন।

তারপর মিনিটখানেক বাদে বললেন, 'চলুন প্রফুল্লবাবু, ওঠা যাক এবার। এগারোটা দশ হয়ে গেছে।'

প্রফুল্লবাবু তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। ডাক্তারের ডাকে চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ চল।'

বাইবে এসে কম্পাউণ্ডার ডিসপেনসারির দোর বন্ধ করে দিল। ডাক্তার নিজে তালাটা টেনে দেখলেন ঠিক মত লেগেছে কিনা।

তারপর প্রফুল্লবাবুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'চলি। কাল আবার দেখা হবে। আপনি তো উল্টো দিকে যাবেন। আপনাকে কি একটু এগিয়ে দেব ?'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'না না ডাক্তার, তুমি বাড়ি চলে যাও। তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই ভাবছে। হয়তো আমাকে বকাবকি করছে তোমাকে আটকে রেখেছি বলে।'

ডাক্তার বললেন, 'কল-টল এলে আরও বেশি রাত হয়ে যায়। সেদিন তো রাত দুটোর সময় এক প্রফেসার আমাকে ডেকে তুললেন তাঁর বাচ্চা মেয়ের অসুখ বলে। আমাদের আবার লাইফ।'

ডাক্তার কম্পাউণ্ডার অতুলকে নিয়ে পশ্চিম মুখে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু প্রফুল্লবাবু পূর্ব দিকে দু' পা এগিয়ে হাতের লাঠি-খানায় ভর করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতে লাঠি, কিন্তু গায়ে

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচানো ধুতি। ভাঁজ-করা সিল্কের চাদর গলাটি ঘিরে রয়েছে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদ ঠিক এখনই ওঠেনি। উঠেছে সেই সন্ধ্যাবেলায়। আজ শুক্লা চতুর্দশী। যাতায়াতের পথে তিনি চাঁদের অস্তিত্বকে আরো কয়েকবার অনুভব করেছেন। কিন্তু এমন করে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ান নি।

শুধু এই রাস্তাটিই নয়, দু দিকের বাড়িগুলি, একটু দূরের ওই ঘুমন্ত নিমগাছটি নীরবে জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করছে। এই মুহূর্তে পথটি জনশূন্য। বাস বন্ধ হয়ে গেছে। লরিগুলিও এখন আর রাস্তায় নেই।

প্রফুল্লবাবু মনে মনে বললেন, 'আমিও চাঁদের মত একা, নিঃসঙ্গ। কিন্তু আমি চাঁদের ঠিক উল্টো পিঠ।'

ধীরে ধীরে এলোমেলো অর্থহীন যুক্তিহীন অসম্বদ্ধ চিন্তার জালে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। এখন চিন্তা আর কল্পনাই তাঁর একমাত্র বিলাস। স্মৃতি আর কল্পনা। ডাক্তারবাবু-বর্ণিত নাতির বয়সী ওই ছেলেটার সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর মিল আছে। তিনিও অকৃতদার, আধা-ভবঘুরে। তিনিও সংসারের কোথাও ঠিক আবদ্ধ হতে পারেন নি। না কোন পরিবারের সঙ্গে, না কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনিও সারাজীবন ভেসে বেড়ালেন, ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর গায়েও শ্যাওলা জমল না।

অবশ্য ওই ছেলেটির মত তথাকথিত দুর্নীতির কবলে তিনি পড়েন নি। লোকে তাঁকে বরং নীতিবাগীশ রক্ষণশীল বলেই জানে। কামিনী থেকে দূরে, কাঞ্চন থেকে দূরে সুরাসক্তি থেকে দূরে। তাঁর জীবনের পথ সহজ সরল, কুমারী মেয়ের সিঁথির মত। তবু তিনি জানেন পাপ কী, লোভ কী, আসক্তি কী বস্তু। শুধু পুঁথিপত্রে নয়, তীব্র বাসনায় যন্ত্রণায় তিনি সব অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন। সে

অভিজ্ঞতা আভ্যন্তরীণ। তবুও তা অভিজ্ঞতা। তিনি যেন পঁচাত্তরটি জন্মদিন পার হয়ে আসেন নি, পঁচাত্তরটি জন্মও উত্তীর্ণ হয়েছেন। সব জন্ম দেবজন্ম নয়, মনুষ্যজন্মও নয়।

প্রফুল্লবাবু বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন, 'ওই ছেলেটির সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কোন মিল নেই। তবু আমি অন্তরের মধ্যে ওকে ধারণ করতে পারি। ওর সুখ-দুঃখ যেন আমারই সুখ-দুঃখ। ও যেন আমারই মধ্যে বেড়ে উঠেছে। আমার দ্বিতীয় সত্তা। আমি এক-সময় অভিনয় করতাম। শখের অভিনয়। তবু থিয়েটারে নামকরা অভিনেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি পার্ট করেছি, হাততালি পেয়েছি। আমি এখনো ওই ছেলেটির রোল প্লে করতে পারি। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারি আমার সন্তান গর্ভে নিয়ে আমার ভালোবাসার মেয়েটি কি ভাবে দিনে দিনে রূপান্তরিত হচ্ছে, লাবণ্যে লাবণ্যে ভরে উঠছে, সর্বাঙ্গ জুড়ে তার মাতৃত্বের ধন্য ধন্য ধ্বনি স্ফুরিত হচ্ছে। আবার সংশয় সন্দেহে বিষাক্ত বিদ্বেষে জ্বলতে জ্বলতে আবিল দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারি আমারই প্রণয়িনী অন্য পুরুষের প্রণয়-চিহ্ন দেহে নিয়ে কি ভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে। দিনে দিনে বিরূপা বিপুলা স্ফীতোদরা হয়ে উঠছে। আমি একই সঙ্গে ওই দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করতে পারি। পারি আমি, এখনো সব পারি। কিন্তু কেউ কি আমাকে এখন আর ওই যুবকের পার্ট প্লে করতে দেবে?'

যৌবন তো গেছেই, কিন্তু থিয়েটারে যুবকের ভূমিকাও তিনি আর পাবেন না এই বসন্তোৎসবের রাত্রে সেই দুঃখই যেন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠে প্রফুল্লবাবুর মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে রাখল।

মিনি বাস

গুটি চার-পাঁচ মিনি বাস পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বাস স্ট্যাণ্ড জায়গা বদলাতে বদলাতে এখন এখানে চলে এসেছে। সীতেশ ছু'পা এগিয়ে গিয়ে সামনে যে বাসটা দেখল সেটাতেই উঠতে যাচ্ছিল, বাসের ভিতর থেকে একটি তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'এটা নয় দাদা, এটা নয়। ওই পিছনেরটা যাবে। ছ'শো আট নম্বরে উঠুন।'

হাফ প্যাণ্ট পরা বাচ্চা ছেলে, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। আয়েস করে সিগারেট টানছে ছেলেটা। বোধ হয় ক্লিনারের কাজ করে।

একটু এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাসটায় উঠল সীতেশ। কিন্তু এই বাসটিরও ছাড়ার লক্ষণ নেই। ব্যাগ কাঁধে কণ্ডাকটার ছেলেটি ড্রাইভারের সীটের বাঁ দিকে যে লম্বা বেঞ্চটি আছে তাতে টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। একজন প্যাসেঞ্জারকে উঠতে দেখেও সে একইভাবে পড়ে রইল।

সীতেশ জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাসটা যাবে তো?'

ছেলেটি সংক্ষেপে জবাব দিল, 'যাবে।'

সীতেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কখন যাবে?'

ছেলেটি বলল, 'স্টার্টারকে জিজ্ঞেস করুন। এইমাত্র একটা বাস ছেড়ে গেল। মিনিট পাঁচ-সাত দেরি হবে।'

একটু দূরে অল্পদিন হল একটা চায়ের দোকান বসেছে। সেখানে কয়েকটি ছেলে জটলা করছে। চা খাচ্ছে। ওই দলে বোধ হয়

স্টার্টারও আছে। কিন্তু তাকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার মত উৎসাহ বোধ করল না সীতেশ।

বেলা একটা। এই সময় সব বাসই একটু দেরিতে দেরিতে ছাড়ে। ইচ্ছা করলে সীতেশ এই বাস থেকে নেমে গিয়ে একটা প্রাইভেট বাস ধরতে পারে। আজকাল অনেক রুটের বাসই এই পথ দিয়ে যায়। কিন্তু এখন কোন তাড়া নেই। উঠে যখন বসেছে আর নেমে গিয়ে কি হবে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে না হোক দশ মিনিটেব মধ্যে তো ছাড়বেই।

মিনি বাসে সাধাবণতঃ ওঠে না সীতেশ। ভাড়া বড্ড বেশি। সাধারণ বাসের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি। যাবা গোটা একটা ট্যাক্সিতে যায় কি শেয়ারে যাতায়াত করে তাদের পক্ষে কম। কিন্তু সীতেশের মত সাধারণ বাস-ট্রামের যাত্রীদের পক্ষে এই মিনি বাসে ওঠাও একটা বিলাসিতা। তবু মাসের প্রথমে মাইনেটা হাতে পেয়ে একটু বিলাসিতা করতে কারই বা না ইচ্ছা হয়। বাজার খরচটা আপনিই বেড়ে যায়। তখন কি আর হিসাব থাকে চতুর্থ সপ্তাহে টানাটানি পড়বে।

একটু হিসাব করে চলতে হয় বই কি সীতেশ গুপ্তকে। সংসারে পুরো মাসের আর্নিং মেম্বার সে একাই। বিধবা মা আছেন। আর আছে দুটি অনূঢ়া বোন। তাবা বি. এ. পাস করে বসে আছে। চাকরিও হচ্ছে না। দেখতে সুশ্রী নয় বলে বিয়ের সম্বন্ধও তেমন আসছে না। তবে দাদাকে সাহায্য করার জন্য এদের চেষ্টার অন্ত নেই। ওরা টিউশনি করে, পার্ট টাইমের কাজ তা যত কম মাইনেরই হোক, আর কম মেয়াদেরই হোক, পেলেই নিয়ে নেয়। ওদের কোন অভিমান নেই। সংসারে ব্যয় সংকোচের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করে চিত্রা আর রমা। বোনেদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই সীতেশের।

তবু মাসের শেষে মেজাজ যেন অকারণে কি সামান্য কারণে বিগড়ে যায়। স্বভাব খিটখিটে হয়ে ওঠে। নিজের আচরণের কথা ভেবে তখন লজ্জিত হয় সীতেশ। মা ও বোনদের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলে। সিনেমার টিকিট কিনে দিতে চায়।

আচার-ব্যবহারের এই বৈষম্য শুধু কি মাসের শেষ কটা দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে? তা নয়। সারা মাসের মধ্যেই তা ছড়িয়ে থাকে। রাগটা দপ করে জ্বলে উঠে আবার খপ করে নিভেও যায়। কিন্তু সেই প্রজ্বলনের মুহূর্ত কটি বড় প্রখর। অসহায় তিনটি নারী প্রায় মৌনভাবে সীতেশের সেই ক্রোধের দীপ্তি সহ্য করে। কিন্তু মনে মনে সব সময়ই যে তারা সীতেশকে ক্ষমা করে তা নয়। তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় তারা ভিতরে একটা প্রতিবাদ পুষে রেখেছে।

কিন্তু এখন মাসের এই প্রথম সপ্তাহে সীতেশের মন বেশ প্রসন্ন। সরকারী অফিসে আজ সেকেণ্ড স্যাটারডের ছুটি। পুরোনো বন্ধু রমেন আজ তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। তার অফিস ছুটি হবে বেলা দেড়টায়। দুজনে মিলে আজ সারাটা দিন একসঙ্গে কাটাবে। রেস্টুরেণ্টে খাবে, গল্প করবে, চৌরঙ্গী পাড়ায় সিনেমা দেখবে। ম্যাটিনি শোতে নয়, হয় সন্ধ্যায় না হয় নাইট শোতে।

মা আর বোনেদের কাছে বলেই এসেছে সীতেশ, 'ফিরতে যদি রাত হয় চিন্তা করো না।'

রমেনও এখন পর্যন্ত বিয়েটিয়ে করেনি। তবে তার ওপর সংসারের এমন দায়দায়িত্ব চেপে নেই। বিয়ে না করাটা ওর খেয়ালখুশির ব্যাপার। ওর কথাবার্তার ধরনে মনে হয় ওর পছন্দমত মেয়ে ঠিক করাই আছে। যে কোন দিন বিয়ে করলেই হল।

মা মাঝে মাঝে সীতেশকে বলেন, 'চিত্রা রমার কপালে বোধ হয় বিয়ে লেখা নেই। ওদের যা হয় হবে। তুই বিয়েটা করে নে।'

সীতেশ মনে মনে হাসে। মা যে মা সেও ভদ্রতা করে ছেলের সঙ্গে। না কি সীতেশের মন পরীক্ষা করে দেখতে চায়?

স্টার্টার বাঁশী বাজিয়েছে। এবার বাসটা ছেড়ে দেবে। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে একটি মেয়ে এসে মিনি বাসের ভিতরে ঢুকল। কণ্ডাকটার তাকে সাগ্রহে দরজা খুলে দিয়েছে।

দেখেই ওকে চিনতে পারল সীতেশ। না চিনবার কোন কারণ নেই। এক সঙ্গে দু বছর এম. এ পড়েছে—ফিলজফি নিয়ে। পাস করেছে একই সঙ্গে। কিন্তু সে তো পাঁচ বছর আগেকার কথা।

এই পাঁচ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ স্বাভাবিক একটি পরিবর্তন রীণার বিয়ে হয়েছে। আগের চেয়ে একটু যেন পুষ্টাঙ্গী। তবু দেখতে খারাপ লাগে না। ওর ফর্সা রং আর লম্বা চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায়। শাঁখা সিঁদুরে ফিকে নীল রঙের শাড়িতে বেশ দেখাচ্ছে রীণাকে।

প্রথমে সীতেশকে ও বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। নাকি দেখেও না দেখার ভান করছে, কে জানে? পাশের বেঞ্চটায় বসতে যাচ্ছিল রীণা, অভিমান ত্যাগ করে সীতেশই ওকে ডাকল, 'আরে এদিকে এস। এই বেঞ্চে এস।'

রীণা একটু চমকে উঠে সীতেশের দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, 'ও তুমি! আমি দেখতেই পাইনি।'

সীতেশ বলল, 'না পাওয়ারই তো কথা।'

রীণা প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'আহাহা, না পাওয়ার কথা মানে! তুমিই তো কোন সম্পর্ক রাখোনি।'

বাস চলতে শুরু করেছে। মোড় থেকে আরো দু-তিনজন প্যাসেঞ্জার উঠেছে।

সীতেশ বলল, 'বাসের ঝাঁকুনিতে পড়ে যাবে। কেলেঙ্কারি হবে

একটা। তাড়াতাড়ি বসে পড়ো।' নিজে বাইরের দিকে বসে রীণাকে ভেতরের দিকে জানালার ধারে বসতে দিল সীতেশ।

রীণা স্মিতমুখে তার পাশে গিয়ে বসল। কিন্তু মৃদু সমালোচনা করতে ছাড়ল না। হেসে বলল, 'ফ্রন্ট সীট হলেও তোমার এই সীটটি কিন্তু ভাল নয়।'

রীণার হাতে লাল রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ। দুটি ঠোঁটও গাঢ় রক্ত-রঙে রঞ্জিত। রীণা চিরদিনই হেভি মেক-আপের পক্ষপাতী। গয়নাগাটির শখও বেড়েছে। গলায় হার। এক হাতে বালা আর এক হাতে ঘড়ি। কানেও লাল-পাথর বসানো দুল। কপালের টিপটি নীলাভ। শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজের সঙ্গে ম্যাচ করা।

পাশেই বসেছে সীতেশের এককালের অন্তরঙ্গ সহপাঠিনী রীণা। আগেও যেমন বসত আজও তেমনি বসেছে। কিন্তু সীতেশের মনে হচ্ছে এই রীণা যেন আলাদা। শুধু পরস্ত্রীই নয় যেন একটি ভিন্ন-গ্রহের অধিবাসিনী। আর সেই জন্যেই কি আকর্ষণ আর বিকর্ষণের এক মি[illegible]ত অনুভূতি সীতেশের মন থেকে নড়তে চাইছে না!

এই পাড়ারই মেয়ে রীণা। হাউসিং স্টেটে থাকে। মানে থাকত। এখন ওর বাবা মা এই পাইকপাড়াতেই আছেন। ও পাড়া বদল করে চলে গেছে বালিগঞ্জে।

সীতেশ বলল, 'এখন যেন তোমার কী পদবী হয়েছে!'

রীণা বলল, 'আহাহা, যেন জানো না!'

সীতেশ বলল, 'শুনেছিলাম। ভুলে গেছি।'

রীণা বলল, 'তাহলে আর মনে করিয়ে দেব না। নামটা মনে রাখলেই যথেষ্ট। আর চেহারা—চিনতে পারার জন্যে।'

সীতেশ বলল, 'নন্দী হয়েছ, তাই না? চাটুয্যে থেকে নন্দী।'

রীণা হেসে বলল, 'সবই তো মনে আছে দেখছি। তবে কেন অত ভান কারছিলে?'

সীতেশ হেসে বলল, 'বামুন থেকে কায়েতই যদি হতে পারলে বৈদ্য হতে ক্ষতি কি ছিল?'

ভঙ্গিটা তামাশার।

রীণাও তেমনি কৌতুকের ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'হব বলে তো অপেক্ষা করে বসেছিলাম। হতে দিলে কই।'

সবই ঠাট্টা আর তামাশা। দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল তাতে গভীর প্রেম কি বিয়ের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। না উচ্চারিত, না অনুচ্চারিত।

পার্কের পাশ দিয়ে বিশেষ করে অর্কিড উদ্যানের কাছাকাছি এসে রাস্তাটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় গর্ত। বাস সেই গর্তের মধ্যে পড়ে আবার ওঠে। টাল সামলাতে না পেরে রীণা বার বার তার গায়ে ঢলে পড়ছিল।

একবার বলল, 'কী রাস্তাই না। তোমরা থাকো না এ পাড়ায়? একটা ব্যবস্থা করতে পার না?'

সীতেশ বলল, 'আমরা কি ব্যবস্থাপক নাকি?'

এই সময় কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইল।

সীতেশ উঠে দাঁড়াল। ট্রাউজারের হিপপকেটে হাত দিয়ে ছোট একটা ব্যাগ বার করল। তারপর একখানা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'একখানা এসপ্লানেড।'

হঠাৎ তার খেয়াল হল সঙ্গে রীণাও রয়েছে। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'আরে তুমি কোথায় যাবে?'

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। রীণা তার ব্যাগ থেকে দশ টাকার নোটখানি বের করে ফেলেছে। পাঁচ টাকার নোটখানা কেড়ে নিয়ে তার হাতে দশ টাকার নোটখানা গুঁজে দিয়ে রীণা বলল,

'এখানা না, ছুখানা এসপ্ল্যানেড।' তারপরে সেই পাঁচ টাকার নোটখানা জোর করে ফেরত দিল সীতেশকে। সঙ্গে সঙ্গে এক টাকা পাঁচ পয়সার টিকিটখানাও।

সীতেশ বলল, 'এ কী হল। তুমি কেন কাটতে গেলে।'

রীণা বলল, 'তাতে কী হয়েছে। আগে আগে তুমি তো রোজই বাসের ফেয়ার দিতে। ট্যাক্সি ফেয়ারও দিয়েছ ছু-একদিন। আজ না হয় আমিই দিলাম। সামান্য একখানা টিকিটই তো। রেখে দাও।'

তারপরএকটু হেসে সীতেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আধ ঘণ্টার থাকুক না হয় একটি স্যুভেনির।'

সীতেশ গম্ভীর হয়ে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না।

কিন্তু সারাটা পথ বলতে বলতে চলল রীণা। নিজেদের ঘর-ঘরের কথা। স্বামীর কথা। শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা। তাঁরা চান ই নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে। কিন্তু রীণা ছু-একটা বছর যাক। তাদের ডোভার লেনের বাড়াতে পও করল সীতেশকে।

যেয়ো এক... তাড়াতাড়ি যেয়ো। কোথায় হঠাৎ বদলি হবে তার তো ঠিক নেই।'

স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার গ্রেডে কাজ করে দিলীপ। মোটা মাইনের চাকরি। এক ফাঁকে রীণা সে কথা শুনিয়েছে সীতেশকে।

কিন্তু সেই টিকিট কাটার পর কী যে হয়েছে সীতেশের। পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে কিছুতেই প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারছে না।

নিতান্তই ভদ্রতা রক্ষার জন্যে হুঁ, হ্যাঁ করে যাচ্ছে কি ছু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে।

শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এসে ছুজনেই নেমে পড়ল। নিউ মার্কেটে রীণার কি একটু দরকার আছে। সেটা সেরে

বালিগঞ্জের বাসে উঠবে। সীতেশ যাবে তার বন্ধুর অফি। সেখানে সে সীতেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হাসিমুখে বিদায় নিল, বিদায় দিল রীণা।

কিন্তু সীতেশ অমন করে হাসতে পারল কি?

তার কেবলই মনে হতে লাগল, ছি ছি, কি রীণা কী ভাবল তার সম্বন্ধে? নিশ্চয়ই সে ভেবে নিল ছোট আর অনুদার হয়ে গেছে সীতেশের মন। অন্যের স্ত্রী হয়েছে বলে সীতেশ এখন তার জন্যে একটা টাকাও খরচ করতে রাজী নয়।

এ ভুলটা কেন হয়েছে তা ইতিমধ্যে ধরে ফেলেছে সীতেশ। অফিসে যাওয়ার সময় সাধারণ বাসে কোন বন্ধু কি খুব চেনা কোন প্রতিবেশী উঠলে সীতেশ তার জন্যে টিকিট কাটে। কিন্তু মিনি বাসে তারাই যখন ফের ওঠে কেউ কারও জন্যে টিকিট কাটে না। কেউ তার প্রত্যাশাও করে না। একটা টাকাকে সবাই দাম দেয়।

[illegible]তে সেই ভুল হয়েছিল।

কিন্তু রীণা কি আর [illegible] বিশ্বাস করবে?